শ্রীনরেন্দ্রদেব

—এই যে প্রকাশদা এসেছো? ভালই হয়েছে। গ্‌গির চলো, বাবা তোমায় ভয়ানক খুঁজছেন। আমি এইমাত্র বামুনদিকে পাঠাচ্ছিলুম তোমায় ডেকে আনবার জন্য?

—কেন রে নিভা?—মাষ্টারমশাই আজ কেমন আছেন?

—ভাল নয় দাদা, আজ যেন একটু বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে! দিদির একখানা চিঠি আসবার পর থেকে উনি বড্ড ছটফট করছেন! কেবলই তোমায় খুঁজছেন, তুমি এখুনি চলো—

বলতে বলতে নিভা প্রকাশের একটা হাত ধ'রে টানতে টানতে তার বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে।

—বাবা, প্রকাশদা এসেছে।

মাষ্টারমশাই তাঁর রোগশীর্ণ মুখের কোটরগত দুই চক্ষু প্রকাশের দিকে ফিরিয়ে অতি দীনহীন করুণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখলেন, তার পর তাঁর দুর্ব্বল হাত দুখানি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—এসেছো? তোমাকেই খুঁজছিলুম! আমার আর কে আছে বলো—তোমরাই ভরসা—আমার কাছে এসে বসো—বড় দরকার তোমাকে!

তার পর নিভার দিকে চেয়ে বললেন—খুকী, তুই একবার বাইরে যা তো মা, প্রকাশের সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে।

নিভা তার কিশোর মনের অদম্য কৌতূহলকে বহু কষ্টে সংযত করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাষ্টারমশাই তাঁর ক্ষীণ-কণ্ঠ আরও ক্ষীণতর ক'রে প্রকাশকে বললেন—আমার বড় বিপদ প্রকাশ! জয়পুর থেকে আজ বিভার চিঠি পেলুম, জামাইয়ের নাকি সেখানে ভারী অসুখ। দেখবার শোনবার কেউ নেই, পত্রপাঠ আমাকে যেতে লিখেছে; কি করি বলো তো? পাছে মেয়েটা সেই দূর বিদেশে আমার জন্য ভেবে ভেবে সারা হয়,—এই মনে ক'রে আমার অসুখের কোনও খবরই তাকে দিই নি। এখন উপায়?

—কী অসুখ হয়েছে নির্ম্মলবাবুর? কিছু লিখেছে কি সে আপনাকে?—

—লিখেছে; ডাক্তাররা বলেছেন—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

—হাঁ, জয়পুরে এখন ভয়ানক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে বটে, আমাদের দুটি বন্ধু সম্প্রতি সেখান থেকে ফিরেছেন্, তাঁদের মুখে শুনলুম ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সেখানে একেবারে এপিডেমিকের মতো break out করেছে।

কাতর কণ্ঠে মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কী হবে বাবা?

প্রকাশ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললে—ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্। আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করছি। এই অসুস্থ অবস্থায় আপনি যদি ওই সব ভাবেন তাহলে যে আপনার অসুখও বেড়ে যাবে।

—কি করবো বাবা! না ভেবে যে থাকতে পারিনি। ওরা যে আমার মাতৃ-হারা সন্তান!

বলতে বলতে বৃদ্ধের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। মৃতপত্নীর প্রেমের মধুর স্মৃতি তাঁর রোগার্ত্ত অন্তরের মধ্যে যেন তাজমহলের মতোই শুভ্র সমুজ্জ্বল ও বিরাট হয়ে দেখা দিলে।

এই সময় নিভা ঘরের বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—

বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন, তিনি কি একটু অপেক্ষা করবেন?

—কই? তাঁকে ভিতরে নিয়ে এসো না নিভা,—বলতে বলতে প্রকাশ নিজেই বাইরে বেরিয়ে এলো এবং ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে ক'রে ভিতরে নিয়ে গেল।

রোগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখে ডাক্তারের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলে—সকালে মিক্শ্চার একঘণ্টা অন্তর দুবার খেয়েছিলেন কি?

মাষ্টারমশাই অপ্রতিভের মতো বললেন—না ডাক্তারবাবু, মাপ করবেন, আজ আমার মনটা ভাল নেই, ঔষধপত্র খেতে ভুলে গেছি।

প্রকাশ ডাক্তারকে রোগীর মনের অবস্থা সব বুঝিয়ে বললে। ডাক্তার তখন নিজে এক দাগ ওষুধ ঢেলে রোগীকে খাইয়ে দিয়ে যাবার সময় প্রকাশকে ডেকে ব'লে গেলেন—খুব সাবধান, রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন, নাড়ীর যে অবস্থা দেখছি—তাতে সেরে ওঠবার আশা খুবই কম। হঠাৎ মনে কোনও আঘাত পেলে হার্ট-ফেল হ'য়ে মারা যেতে পারেন।

ডাক্তার যেতে না যেতেই নিভা ছুটে এসে সদরের গলিপথেই প্রকাশকে ধ'রে তার সোৎসুক দুই চোখ মেলে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তারবাবু কি ব'লে গেলেন প্রকাশদা?

প্রকাশ একটু ইতস্তত করে বললে—রোগীকে খুব-সাবধানে রাখতে ব'লে গেলেন।

—দিদির জয়পুর থেকে কি চিঠি এসেছে বলো না!

—তোমার জামাইবাবুর বড় অসুখ। তাই মাষ্টারমশাই এতো চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তোমার বাবার শরীরের অবস্থা তুমি কি বিভাকে চিঠিতে জানাও নি কিছু?

—না, বাবা যে বারণ করে দিয়েছিলেন, বললেন—বিভা শুনে বিদেশে ভেবে ভেবে খুন হবে, তাকে আমার অসুখের কথা লিখিস নি খুকী!

—এখন কি করা যায়? বিভা যে টেলিগ্রাম করেছে মাষ্টারমশাইকে এখনি জয়পুরে যাবার জন্যে?

—কী হবে! বাবা যে বিছানাতেও আর উঠে বসতে পারছেন না, কে যাবে?

—তাইতো ভাবছি। ব'লে প্রকাশ সত্যই একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। নিভা অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে নীরবে চেয়ে থেকে তার ডান হাতটি ধ'রে বললে—প্রকাশদা, তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে বলো?—তুমি গিয়ে দিদিকে আর জামাইবাবুকে এখানে নিয়ে এসো।

প্রকাশও ঠিক এই উপায়ই চিন্তা করছিল; কিন্তু এর বিরুদ্ধে যে দুটি কঠিন বাধা আছে, তা কেমন করে অতিক্রম করা যায়, এইটে সে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। প্রথম বাধা—বিভা তাকে জয়পুরে যেতে বিশেষ ক'রে নিষেধ ক'রে দিয়েছে। তার সে কাতর মিনতি ঠেলে সে কোন্ লজ্জায় আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে? বিভা হয় ত মনে করবে, আমি এই সুযোগটুকু গ্রহণ করবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে জয়পুরে ছুটে গেছি! দ্বিতীয় বাধা—আমি জয়পুরে গেলে রোগশয্যাশায়ী মাষ্টারমশাইকে এখানে দেখবে কে?

প্রকাশকে নিরুত্তর থাকতে দেখে নিভা তার হাতটা ধ'রে নাড়া দিয়ে আবার বললে—তোমাকেই যেতে হবে প্রকাশদা, তা-ছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখছিনি।

প্রকাশ বললে—তাই ত নিভা, কিন্তু আমি গেলে এখানে তোমার বাবাকে দেখবে কে?

নিভা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—তুমি গিয়েই তাদের নিয়ে চলে এসো, বেশী দেরী কোরো না। বাবাকে দেখা-শোনার ভার দু'চার দিনের জন্যে তুমি আমার উপর দিয়ে যেতে পারো।

—তুই কি একলাটি সামলাতে পারবি দিদি? এ রকম রোগীকে তোর মতন একটি ছেলেমানুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই কি করে?

নিভা অনুযোগের সুরে বললে—বারে! আমি বুঝি এখনও ছেলেমানুষ আছি? আমার বয়সী কতো মেয়ে তো শ্বশুর-ঘর করছে!

ঈষৎ হেসে প্রকাশ বললে—ওঃ বুঝিচি, তোমারও বুঝি তাদের মতো শ্বশুর-ঘর করবার সাধ হয়েছে? তাই সেই কথাটা এমন ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে জানাচ্ছো?

নিভা লজ্জিত হ'য়ে বললে—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু! আমি বুঝি তাই বললুম?

—তা এতে আর লজ্জা কি? বলেছো বেশ করছো, মাষ্টারমশাই সেরে উঠলেই তোমার বিয়ের আয়োজন করা যাবে!

—আচ্ছা, তাই কোরো, এখন তুমি দয়া ক'রে জয়পুরে রওনা হবার ব্যবস্থা করো প্রকাশদা; দিদি আর জামাই-বাবুকে যেমন করে হোক্ এখানে নিয়ে আসা চাই।

এমন সময় বামুনদিদি এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—নিভাদি, চা'য়ের জল গরম হয়েছে!

নিভা শুনেই ছুটে গেল প্রকাশের জন্য চা ক'রে আন্‌তে। যাবার সময় বলে গেল—এক মিনিট বোসো প্রকাশদা, তোমার চা নিয়ে আসি। যেন পালিয়ো না, ভাই লক্ষীটি!—

নিভা রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল; প্রকাশ সেইদিক পানে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল—বেশী দিনের কথা নয়, বোধ হয় একটা বছরও এখনও পুরো হয়নি এই মেয়েটি ছিল এ বাড়ীর আদুরে মেয়ে, তার দিদির সম্পূর্ণ অধীন এক মাতৃহীনা বালিকা! আর আজ সে একেবারে এ সংসারের হাল ধ'রে কর্ত্রীর আসনে উঠে বসেছে! কথায় বার্ত্তায়, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে—একেবারে পাকা গৃহিণী হয়ে উঠেছে এই কুসুম-কলিকা কিশোরী কুমারী!

নিভার কথাবার্ত্তা যত্ন আদর ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশের মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো বিভার স্মৃতিই বিভাসিত ক'রে তুলছিল।

চা ও জলখাবার নিয়ে নিভা ফিরে আসতেই প্রকাশ বললে—এ তুমি বড্ড অন্যায় করছো নিভা! এই অসুখের বাড়ীতে রোজ রোজ তুমি যদি এই রকম জলখাবারের হাঙ্গামা করো তা হলে সেটা মোটেই ভাল দেখায় না; এক-আধ কাপ্ চা পর্য্যন্ত চলতে পারে বটে, কিন্তু এ সব কি? কোনও দিন কচুরী, কোনও দিন নিমকি, কোনও দিন সিঙাড়া, কোনও দিন—

বাধা দিয়ে নিভা বললে—তোমাকে আর ময়রার দোকানের ফর্দ্দ আওড়াতে হবে না, থামো! অসুখের ছুতো ক'রে অন্য কারুর জলখাবার ফাঁকি দেওয়া চলতে পারে প্রকাশদা, কিন্তু তোমাকেও রোজ না খাইয়ে ছেড়ে দিতুম শুনলে দিদি এসে কি আর আমাকে আস্ত রাখবে?

নিভার মুখে এ কথাটা শুনে প্রকাশ আর চুপ করে থাক্‌তে পারলে না, বলে ফেললে—কেন, তোমার দিদি তো জয়পুর থেকে আমাকে না খাইয়ে ধুলো পায়েই বিদায় করে দিয়েছিল এবং আর কখনও যাতে আমি জয়পুরে না যাই সেই রকম প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়ে ছেড়েছিল! তাই ত ভাবছি নিভা, আমার জয়পুরে যাওয়াটা কি ভাল হবে? তোমার দিদি হয়ত' সেটা মোটেই পছন্দ করবে না!

নিভা এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারলে না। অনেকক্ষণ চুপ করে কি ভাবতে লাগ্‌ল!

প্রকাশ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এর পরও কি তুমি আমায় জয়পুরে যেতে বলো?—

একটু ইতস্তত করে নিভা বললে—না!

—তাহলে উপায়? কাকে জয়পুর পাঠাবো—তাদের আনাবারই বা কি ব্যবস্থা করবো?

ব্যাকুল হয়ে উঠে নিভা বললে—আমি জানিনি ভাই, নারায়ণের মনে যা আছে তাই হবে—ও কি, কচুরি যে একখানা পড়ে রইল, ভাল হয় নি বুঝি? দিদি তৈরি ক'রে দিলে এতক্ষণ আরও চারখানা চেয়ে নিয়ে খেতে!

প্রকাশ অবশিষ্ট কচুরিখানা তুলে নিয়ে বললে—কিছুই যেন আর ভাল লাগে না বোন্—এ জীবনটাই একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেছে—

নিভা কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বামুনদিদি এসে বললে—কর্ত্তা তোমায় খুঁজছেন দিদিমণি!

নিভা ছুটে তার বাবার কাছে গেল।

প্রকাশ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে চললো।—

১৯

প্রকাশ তার পড়বার ঘরে ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবছিল—বিভার টেলিগ্রাম সম্বন্ধে কি করা যায়!

নিদাঘের দীপ্ত দ্বিপ্রহর তখন চারি দিকে উগ্র রৌদ্র-শিখায় অসহ্য দাবদাহ বিকীর্ণ করছিল।

একটি বড় কাঁচের গেলাসে স্ফটিকের মতো একটুকরো বরফ দেওয়া সুশীতল সরবৎ ভ'রে নিয়ে উমা এসে বললে—খেয়ে দেখো না দাদা, এই কাঁচা আমের সরবৎ কেমন হয়েছে।

প্রকাশ সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে সরবতের গেলাসটি নিয়ে একটি মস্ত বড় চুমুক দিয়ে বললে—আঃ! কি আরাম! শরীরটা যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল! চমৎকার সরবৎ করিছিস্ উমা। বেড়ে লাগছে! তৃষ্ণায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছিল; আচ্ছা, তুই কি হাত গুণ্‌তে জানিস্? কি ক'রে টের পেলি যে এ সময় এক গ্লাশ ঠাণ্ডা সরবৎ আমার কাছে একেবারে অমৃতের মতো সুস্বাদু লাগবে!

উমা একটু গর্ব্বের ও তৃপ্তির হাসি হেসে বললে—তোমাদের কখন কি প্রয়োজন তা' জানবার জন্য আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার আবশ্যক হয় না। আমরা by instinct টের পাই। নইলে ঘর-সংসার চালানো সম্বন্ধে আমরা তোমাদেরই মতো অযোগ্য হয়ে দাঁড়াতুম।

—ইস! একেবারে পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছেন দেখছি! একফোঁটা মেয়ে—অহঙ্কারে আর মাটিতে পা' পড়ে না যে! বাবা আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটির পরকাল ঝর্ঝরে ক'রে দিয়েছেন!

উমা বললে—আদরে বাঁদর হয়ে ওঠে ছেলেরা—মেয়েরা নয়! কত কষ্ট ক'রে আমি এই ঠিক দুপুর রোদে তোমার জন্য আম পুড়িয়ে সরবৎ ক'রে এনে খাওয়ালুম, কোথায় তুমি আমায় ধন্যবাদ দেবে—তা' নয় উল্টে বকুনি! পুরুষ জাতটাই বড় অকৃতজ্ঞ!

—তোমার এ অভিযোগ যে এতটুকুও সত্য নয়, মাষ্টার মশাইয়ের ছোট মেয়ে নিভা তার সাক্ষী দিতে পারবে।

—ওঃ! ভারী তো; মাষ্টারমশাইয়ের অসুখ করেছে শুনে দু'বেলা তাঁর দেখা-শোনা ও চিকিৎসার একটু তদ্বির করছো ব'লে অম্নি 'তম' হয়েছে যে! ... কিন্তু আমি যে জানি দাদা, তুমি এ অসুখের তদ্বির করতে যাও মাষ্টার-মশাইয়ের খাতিরে নয়,—আমাকে তে আর তুমি বোকা বোঝাতে পারবে না!

প্রকাশ একটু লজ্জিত হয়ে উঠে বললে—কেন, তার সঙ্গে আর এখন আমার খাতির কিসের?

বলতে বলতে টেবিলের উপর থেকে বিভার টেলিগ্রাম-খানা তুলে নিয়ে চকিতের মধ্যে একবার দেখে প্রকাশ হাতের মুঠোর মধ্যে সেটাকে দুমড়ে ফেলতে লাগ্‌ল।

উমা গম্ভীর ভাবে বললে—দেখো দাদা, তুমি আমাদের যদি ঠকাতে চাও—ঠকাও, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দোহাই তোমার ভাই, নিজেকে কোন দিন ঠকাবার চেষ্টা কোরো না।... তোমার হাতে ওটা কি, একখানা টেলিগ্রামের মতো দেখছি না? কার কাছ থেকে 'তার' এসেছে ভাই? লুকোচ্ছো কেন?—বিভা কি টেলিগ্রাম করেছে?

প্রকাশ অন্যমনস্ক ভাবে বললে—হুঁ।

—wire করেছে কেন? তোমায় কি জয়পুরে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে? চিঠিতে হল না—আবার টেলিগ্রাম! ব্যাকুলতা বড় বেশী দেখ্‌ছি!

প্রকাশ চম্‌কে উঠে বললে—চিঠি? চিঠি এসেছে না কি কিছু আমার নামে? কই পাই নি তো? শুধু মাষ্টার-মশাইকে তো এই টেলিগ্রাম করেছে!

এই বলে প্রকাশ সেই দুমড়ানো টেলিগ্রামখানা উমার সামনে ফেলে দিলে। উমা টেলিগ্রামখানা তুলে নিয়ে পড়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লো। তার চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে কি করবে দাদা? তোমাকে তো আজ রাত্রের গাড়ীতেই চলে যেতে হয়।

প্রকাশ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে সে মুখে কোথাও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নেই। একটা আন্তরিক উৎকণ্ঠায় উমার মুখখানি সত্যই যেন কাতর হয়ে উঠেছে! প্রকাশ তার এই স্নেহময়ী সোদরার অকৃত্রিম সহানুভূতিটুকু অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পেরে ব্যাকুল হয়ে বললে—কিন্তু মাষ্টারমশাইকে এখানে কে দেখবে উমা? তাঁর অবস্থা যে খুবই খারাপ। কখন যে কি হয় কিছু বলা যায় না। নিভা একলা—ছেলেমানুষ—বেচারা কি বিপদেই পড়বে বল তো?

—সে জন্যে তুমি কিছু ভেবো না দাদা, তুমি যে ক'দিন না ফেরো আমি রোজ দুপুরে গিয়ে নিভার কাছে থাকবো। আর ডাক্তার ডাকা ওষুধপত্র আনা প্রভৃতি মাষ্টারমশাইয়ের পরিচর্য্যার ভার আমি ভোলাদা'র ঘাড়ে চাপিয়ে দেবো!

প্রকাশ একটু কিন্তু হয়ে বললে—ভোলাটা কি তেমন interest নেবে?

—নিশ্চয় নেবে, তুমি কি বলছো দাদা? ও হলো আমাদের পাড়ার রামকৃষ্ণ-সেবা-সমিতির প্রধান পাণ্ডা। সেবা-শুশ্রূষার কাজ ও খুব ভাল জানে এবং করতেও ভালবাসে। আমি তো ভোলাদা'র কাছেই 'Nursing—'First aid'—এ সব শিখেছি। আমি যদি তাকে জোর করে বলি যে, ভোলাদা, তোমাকে এ কাজটা করতেই হবে ভাই। ভোলাদা'র সাধ্য কি যে না বলে।

প্রকাশ সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললে—তা বটে, বাঁদরটা তোর কথায় ওঠে বসে, তোকে বড্ড মানে—কেন বল্ তো?—তোর ওপোর ওর এতো ভক্তি হল কিসে?

—'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' বলে আমাদের দেশে যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে সেটা দেখছি খুব ঠিক্। ভোলাদা হলো বাঁদর—আর তোমার বন্ধুরা সব মানুষ! সে বেচারী দামোদর flood-এ ছুটে গেল, বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে কাজ ক'রে এলো—পূর্ব্ববঙ্গের সাইক্লোন্ রিলিফে গিয়ে work করলে। নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে কলেজ ছাড়লে, খদ্দর পিকেটিং-এ গিয়ে একমাস জেল খেটে এলো! কংগ্রেস কমিটীতে কাজ করছে, সেবা-সমিতি খুলেছে, তরুণ সঙ্ঘের দলপতি,—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, গোলদীঘির সভার একজন প্রধান বক্তা, ম্যালেরিয়া কালাজ্বর নিবারণে বরোদা ডাক্তারের ডান হাত, বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতির একজন প্রবল প্রচারক, আর্য্য-সমাজের মস্ত মেম্বার, ছাত্র-সমাজের স্বয়ং-নির্ব্বাচিত নেতা—বলে যা না সব, ওগুলো আর বাকী থাকে কেন? কিন্তু হচ্ছে কি তাতে শুনি? তুই তো তাকে এই সব কাজে উৎসাহ দিয়ে তার মাথাটা খেয়েছিস্! একটা লোক কখনও এত কাজ করতে পারে? অসম্ভব! তাই কোনও কাজই তার দ্বারা হচ্ছে না। গিধোড় মোটা খদ্দর প'রে—খোঁচা খোঁচা দাড়ী গোঁফ নিয়ে—একমাথা উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুলের ঝাঁক্ড়া নিয়ে একটা ডাকাতের সর্দ্দারের মতো চেহারা ক'রে তুলে—খালি যেখানে সেখানে চীৎকার করে লোকের কানে তালা ধরিয়ে এবং নিজের গলা ধরিয়ে বেড়াচ্ছে বই ত' নয়, কাজটা কি হচ্ছে তাতে? ও একটা এখন ওর নেশা এবং পেশায় দাঁড়িয়ে গেছে!

—আব্‌গারী বিভাগের নেশার চেয়ে এ রকম নেশা ঢের ভালো—কিন্তু 'পেশা' বোলো না দাদা, ওটা একটু আপত্তিজনক!

—পেশা নয়ত কি? পয়সা হয়ত' পায় না তাই নেয় না—কিন্তু ভোলানাথের পেশাটা কি যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলতেই হবে ওই ওর পেশা! ভায়া আমার একেবারে 'সব-জান্তা' হয়ে উঠেছেন! রাজনীতির তো একজন ধুরন্ধর হয়ে পড়েছেনই—মাঝে মাঝে কেশবের আড্ডায় গিয়েও উদয় হন। সেখানে সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য এমন কোনও বিষয় নেই যে সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা না শুনতে পাওয়া যায়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্তই তিনি জানেন!

—বেশ তো, সেটা তো একটা গুণ, সেটাকে তো আর তুমি দোষ বলতে পার না?

—আরে না জেনেই পণ্ডিত সাজে যে!—তবুও আমি ভাল বলতে পারতুম, যদি ও এত পরনিন্দা পরকুৎসা ক'রে না বেড়িয়ে সত্যিই দেশের একটা কিছু কাজ করতে পারতো; ছোকরা কাজ করে যতটুকু তার চেয়ে কথা বলে ঢের বেশী এবং মিছে কথা বলে আরও বেশী!

—তুমি দেখছি দাদা, ওকে দুচক্ষে দেখতে পারো না। আচ্ছা, ভোলাদা না হয় কিছুই করে না—স্বীকার করলুম কিন্তু তোমরা কি করো শুনি? একখানা খদ্দরের কাপড় পরেও তো কেউ দেশের একটু উপকার করতে চাও না!

আমরা যেমন কিছু করি নে তেমনি দেশউদ্ধারের দাবীও কোনও দিন রাখিনি।

—কিছু না-করার চেয়ে কিছু-করার চেষ্টাও কি ভাল নয়? কথায় বলে ধর্ম্মের ভাণও ভালো!

—না উমা, ওইটে তোমার মস্ত ভুল! কোনও কিছুরই

ভাণ কখনো ভাল হতে পারে না। ওতে শুধু ভণ্ডামীটাই বেড়ে ওঠে।

—তুমি কি বলতে চাও ভোলাদা একজন ভণ্ড! ও যা করে তা ও sincerely করে না!

—আমি কিছু বলতে চাইনি। ভোলার সম্বন্ধে তোমার একটু দুর্ব্বলতা আছে; ওর বিরুদ্ধে কিছু বলে আমি তোমার সঙ্গে একটা দাঙ্গা বাধাতে ইচ্ছে করিনি, তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, sincerity of purpose-এর ধূয়ো ধরে কোনও অকাজকেই বেশীদিন সমর্থন করা চলে না!

—যাক্‌গে ওসব তর্ক এখন থাক্, আর একদিন করা যাবে, এখন কাজের কথাটা আগে হয়ে যাক্। ভোলাদা'র উপর তাহলে তুমি মাষ্টারমশাইয়ের দেখা-শোনার ভার দিয়ে যেতে রাজি নও, কেমন?

—বিলক্ষণ! তুই যখন তাকে এমন strongly recommend কর্‌ছিস, তখন আর আমার আপত্তি কি থাকতে পারে? কিন্তু আসল কথাটাই যে তুই ভুলে যাচ্ছিস; আমি জয়পুরে যাবো কেমন করে? মাথার দিব্যি দিয়ে সে বারণ করে দিয়েছিল বলিছিলুম মনে নেই?

উমা একটু হেসে ফেলে বললে—সে সব এ ক্ষেত্রে মানতে গেলে চলে না দাদা। রোসো, রোসো, যে তর্ক জুড়েছিল, আমি একেবারেই ভুলে গেছলুম। তোমার নামে আজ জয়পুর থেকে একখানা চিঠি এসেছে। খামের উপর মেয়েলী ইংরিজীতে ঠিকানা লেখা দেখেই আমি বুঝতে পারলুন যে, এ নিশ্চয় বিভা লিখেছে! এই চিঠিখানার জন্য আমি তোমার চেয়েও ঢের বেশী আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলুম কি না!

—কেন?

—কেন আর কি? নারীর সেই সনাতন কৌতূহল—বলতে বলতে উমা তার বস্ত্রাঞ্চলের ভিতর থেকে একখানি পত্র বার করে প্রকাশের হাতে দিয়ে বললে—তোমাকে এই চিঠিখানি দিয়ে খুশী ক'রে তোমার কাছ থেকে একটা কিছু present বাগিয়ে নেবার ফিকিরে ছিলুম!

ক্ষিপ্র হস্তে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা বার ক'রে চকিতের মধ্যে বার দুই পড়ে নিয়ে প্রকাশ বললে—আজ রাত্রের ট্রেণেই যাবো উমা। তুই মাকে আর বাবাকে বলে ক'য়ে সব ঠিক ক'রে রাখিস। আর যে ক'দিন না ফিরি তোর ভোলাদা'কেই ডেকে মাষ্টারমশাইদের তত্ত্বাবধানের ভার দিস।

উমা একটু মুখ টিপে হেসে বললে—এই না বলছিলে, জয়পুরে আর তোমার যাবার উপায় নেই—সে নাকি মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করে দিয়েছে—

অস্থির হয়ে উঠে প্রকাশ বললে—আঃ! তুই কিছু বুঝিস নি! তার যে বড় বিপদ! এই দুর্দ্দিনে সে আমাকে কাছে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি কি না গিয়ে থাক্‌তে পারি। এই কি আমার অভিমান ক'রে বসে থাক্‌বার সময়? এই দেখ্ না বিভা কি লিখেছে—

উমা চিঠিখানা পড়তে লাগ্‌ল—

শ্রীচরণেষু—

প্রকাশদা, দর্পহারী মধুসূদন আমার দর্প চূর্ণ করেছেন। যেমনি তোমাকে একদিন এ বাড়ীর দ্বারদেশ থেকে ধূলো পায়ে বিদায় ক'রে দিয়েছিলুম, তেমনি আজ আবার পায়ে ধরে ডাকতে এসেছি। আমার বড় বিপদ, পত্র পাঠ তুমি বাবাকে ও নিভাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসো। বাবাকে একখানি টেলিগ্রাম করলুম। তাইতে সব জানতে পারবে। তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে সাহস হচ্ছিল না। মনটা এমন হয়ে আছে কি বলবো! আজ দায়ে ঠেকেছি তাই তোমার শরণাপন্ন হলুম। আমি খুব স্বার্থপর, না? তোমাকে সেদিন দূরে সরিয়ে দিয়েই দূরে রাখতে পারবো ভেবেছিলুম, কিন্তু কি ভুলই যে করিছিলুম তা আজ মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করতে পারছি! তুমি যদি এ শাস্তির অসহ্য বেদনা বুঝতে পারো তাহলে আমার জন্য চোখের জল না ফেলে থাকতে পারবে না। অতিথিসৎকারে বিমুখ দেখে তুমি কি দুর্ব্বাসার মতো অভিসম্পাত দিয়ে গেছলে কিছু? নইলে, সেদিনের আক্ষেপটা আমাকে এখন প্রতিদিন বজ্রাঙ্কুশের মতো মর্ম্মান্তিক বিঁধ্‌ছে কেন? তুমি কি ক্ষমা করতে পারবে

না ?—নিশ্চয় পারবে ! এসো এসো এসো ! তুমি না এলে কিন্তু আমি একটুও ভরসা পাচ্ছি নে। ইতি

তোমার প্রণতা সেবিকা
'বিভা'

পুন—ইনি এই অসুখের মধ্যেও অনেকবার তোমার নাম করে তোমায় খুঁজেছেন।—বিঃ

চিঠিখানা পড়া শেষ ক'রে সহাস্য মুখে উমা বললে—কেমন দাদা, আমার কথা মিল্‌লো কি ?—এই সব অসুখ বিসুখের ফ্যাসাদগুলো না থাকলে আমি এই চিঠির জন্যে তোমার কাছ থেকে কিছু আদায় না ক'রে কিন্তু ছাড়তুম না !

ঈষৎ হেসে প্রকাশ বললে—সে আমি জানি। ছুতো না ক'রে তুই তো কখনও কিছু চাইতে পারিস্ নি ! কারুর কাছে কোন কারণেই ঋণী হবো না—প্রতিজ্ঞা ক'রে তুই যে শেষটা সেই কারুদের দলে আমাকে আর বাবাকেও ফেল্‌বি তা কি জানতুম ! ··· কি পেলে তুই খুশী হবি বল্ ?

—বারে ! আমি বুঝি তোমাদের কাছে কিছু চাই নি ?—আচ্ছা, আমার চাওয়াটা পাওনা রইল দাদা, একদিন হয়ত আমার চাওয়ার লগ্ন আসবে, সেদিন যেন উমি পোড়ামুখীকে মেরে তাড়িয়ে দিও না। ··· এখন আমি চললুম—তোমার যাওয়ার সব গোছ ক'রে দিই গে—

—আমিও একবার গিয়ে মাষ্টারমশাই আর নিভাকে বলে আসি যে, আমিই যাবো, নইলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

—এই রোদ্দরে বেরুবে—

—রোদ আর নেই। তিনটে বাজে, বেলা পড়ে এসেছে, ঐ দেখ, না রাস্তায় জল দিয়ে যাচ্ছে—বলতে বলতে প্রকাশ উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে ছাতিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছ থেকে চেঁচিয়ে বলে গেল—তুই আমার সব গুছিয়ে রাখিস উমা !

—ক্রমশ

কবি শশাঙ্কমোহন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

নববর্ষের প্রারম্ভেই বাংলার সাহিত্য-গগন হইতে একটি উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নক্ষত্রের পতন হইল। চিন্তাশীল কবি ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শশাঙ্কমোহন সেন গত ৩রা বৈশাখ হঠাৎ হৃদ্‌রোগে কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাণী-মন্দিরের একনিষ্ঠ এবং স্পর্দ্ধাবিহীন একজন সেবককে অকালে বিদায় দিতে হইল! শশাঙ্কমোহনের

স্থান কখন পূরণ হইবে কে জানে! আজ তাঁহার কাব্য এবং চরিত্র বিষয়ে যথার্থ প্রশংসা করিতে যে অতিশয়োক্তি না হইয়া অল্পোক্তিই হইবে, ইহাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়।

তিনি প্রায় দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃতির রম্যভূমি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশব হইতেই তদীয় জন্মভূমির অমর সন্তান কবিবর নবীনচন্দ্র, নবীনচন্দ্র দাস এবং বীরেন্দ্র-

কুমার প্রভৃতির ন্যায় সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা এবং ভাবুকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার চট্টলাজননীর সুবিন্যস্ত শৈলমালা, ফেনিল তরঙ্গময় সিন্ধু এবং মুক্ত আকাশ শশাঙ্কমোহনের চিত্তবৃত্তিকে পৃথিবীর ধূলি-মাটি হইতে সরাইয়া যেন শৈশব হইতেই কোন্ এক আধ্যাত্মিক ভাবের রাজ্যে উপস্থাপিত করিয়াছিল। তিনি স্বভাবসিদ্ধ অথচ আত্মগোপনকারী কবি, তিনি শুধু কাব্যের স্রষ্টা ছিলেন না, তিনি সংস্কৃত সাহিত্য এবং বিদেশী সাহিত্যেরও অসাধারণ অধীতি ছিলেন এবং এই অধ্যয়নের ফলে তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের স্বরূপ আঁকিতে পারিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-আলোচনা-সমৃদ্ধ গদ্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে চিরদিন অমূল্য এবং অভিনব হইয়া রহিবে। সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ। তিনি ছাত্রজীবনেও বি, এ পরীক্ষার সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ভকিল হইয়াছিলেন, কিন্তু বাণীর সেবক আইন-কানুনে বদ্ধ রহিলেন না। গুণগ্রাহী স্যর আশুতোষ তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। তিনি অনন্যচিত্তে বাণীর সেবা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, বিশেষতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বের কয়েক মাস হইতে তিনি ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে একেবারে শয্যাশায়ী ছিলেন।

শশাঙ্কমোহনের কাব্য-জীবন সর্ব্ববিধ জনসাধারণের কাছে পরিচিত এবং আদৃত নহে, কারণ তিনি জনসাধারণের চিত্তকে বাহ্যিক আড়ম্বর বা বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের চিত্তে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কখনও চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রশংসাকামীদের কোলাহল হইতে নিজকে দূরে সরাইয়া রাখিতেন। আত্ম-গোপন করিয়া চলিবার ভাব তাঁহার মধ্যে চিরদিনই ছিল। তিনি গাহিতে জানিতেন বলিয়াই গাহিতেন। তিনি ইহা বেশ বুঝিতেন যে, কাব্যের মধ্যে যদি সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ এবং সাহিত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহে, তবে তাহা ভবিষ্যতে হইলেও একদিন সুধীসমাজের চিত্তে আসন লাভ করিতে পারে। অধিকন্তু তিনি যেই সাত্বিকভাব-সাধনাপূর্ণ অভিনব জ্ঞান-সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়া কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একান্তভাবে বুঝিয়া লইবার মত ক্ষমতা অল্প সাহিত্যামোদীরই থাকে। তাঁহার চিন্তা এবং কল্পনা সর্ব্বত্র অসাধারণতা অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধ জগতের সন্ধানে ব্যস্ত রহিয়াছে।

কবি ও পণ্ডিত শশাঙ্কমোহনের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন গুণ দেখা যায়, অথচ উভয় গুণই অপূর্ব্ব গৌরবে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। তিনি এক দিকে যেমন দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা অর্থাৎ কবি, আবার অন্য দিকে তেমনি অধ্যয়নশীল পণ্ডিত ও বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সমালোচক। বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনায় সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শে সাহিত্যের মাপকাটির প্রকৃত অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই শশাঙ্কমোহন ছিলেন। তাঁহার কাব্যে যেমন সরল ছন্দ, উদার আধ্যাত্মিকতা এবং সরল সহৃদয়তা আছে, তেমনি গদ্য-আলোচনার মধ্যেও ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং স্বাধীনতা, বিচার-নৈপুণ্য ও ক্ষমতা সমভাবে বিদ্যমান।

শশাঙ্কমোহনের অপরিণত বয়সের প্রথম কাব্য 'সিন্ধু-সঙ্গীত'-এ তিনি মানবচিত্তে সিন্ধুতত্ত্বের কর্ম্ম-প্রেরণা ও সত্য-প্রেম-সৌন্দর্য্যের অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি এই প্রথম কাব্যে যে অতলস্পর্শী ভাবপ্রবণতা,কল্পনার বৈচিত্র্য ও সহৃদয়তাপূর্ণ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন তাহাকে তাঁহার পরিণত বয়সের কাব্য-সম্পদও অতিক্রম করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বলিতে গেলে এই 'সিন্ধু-সঙ্গীত' কবির জন্মভূমি চট্টগ্রামেরই দান। তিনি আশৈশব কর্ণফুলী এবং বঙ্গসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া সিন্ধুর যে মর্ম্মসঙ্গীত শুনিয়াছেন, এবং উহার ভিতর যে মানবচিত্ত দর্শন করিয়াছেন ইহা তাহারই ইতিহাস।

সিন্ধুর পরেই কবি শৈলকিরীটিনীর শৈলমালা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 'শৈল-সঙ্গীত' করিয়াছেন। তাঁহার 'শৈল-সঙ্গীত' প্রেম, স্বাধীনতা এবং ধ্যানগত ভক্তি-মূলক কাব্য। ভাব এবং ছন্দের তরলতায় 'সিন্ধুসঙ্গীত'-এ কবির স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা অপূর্ব্ব সাত্বিকতাময় সৌন্দর্য্যচিত্র-দানের সহিত এই কাব্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে। শুধু সাগরে এবং পর্ব্বতে নহে, চট্টলার উদার নীলিম আকাশও কবি-চিত্তকে আমন্ত্রণ

করিয়াছে। এই আহ্বানের অমৃতময় ফল তাঁহার শেষ বয়সের 'বিমানিকা'। ইহাকে উপনিষদ্-যুগের ভাবের আধুনিক সংস্করণ বলিলেও চলে। প্রাচীন-সাহিত্যের বিস্মৃত-প্রায় উদারতা এবং মাহাত্ম্যকে কবি বিমানতত্ত্বে সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন এবং লোক-চিত্তের মধ্যে মহাকাশের অনুভূতি দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি 'বিমানিকা'য় বলিয়াছেন—

'কবিতা আমার মেঘের মতন হোক,
অনলে, ধ্বনিতে, বারিতে পুরিত হোক।'

নির্ব্বাপিতকে উদ্দীপিত করিতে, মন্দের গতি ফিরাইতে এবং দুঃখিত চিত্তকে সান্ত্বনা দিতে যথাক্রমে অনল, ধ্বনি এবং বারির প্রয়োজন নহে কি? তাঁহার কবিতার মধ্যে ধুলি-মাটির চিহ্ন নাই, লালসার দুর্গন্ধ নাই, পতিত প্রেমের কথা নাই,—আছে সাগর-শৈল-বিমানের অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত, নিখুঁত প্রেমের ইতিহাস। অপূর্ব্ব সাত্ত্বিকতাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

শশাঙ্কমোহনের 'সাবিত্রী' নাট্যকাব্য হইলেও উহা প্রেমতত্ত্বমূলক কাব্য। মানুষের প্রেম যে অকারণ জ্ঞান-বৈরাগ্যকে প্রকৃতির উদ্দীপনায় অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় তাহার চিত্রই কবি ভাষার সৌষ্ঠবে ও ভাবের গৌরবে আঁকিয়াছেন। তাঁহার পরিণত বয়সের 'স্বপ্নপুরী' ও 'সাবিত্রী'র বৈশিষ্ট্যকে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। এই কাব্যে শশাঙ্কমোহন যে কবিত্ব এবং মৌলিকতার পরিচয় দিয়া প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা চিরদিন বঙ্গ-সাহিত্যে অপূর্ব্ব গৌরবে সমুজ্জ্বল রহিবে।

শশাঙ্কমোহনের 'স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে' একটি প্রেমতত্ত্বমূলক কাব্য। অনেক সাহিত্যরথী এই কাব্যকে সর্ব্ববিধ প্রেম-গাথার শীর্ষে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তিনি মর্ত্ত্যে প্রেমের স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মিলন ঘটাইয়াছেন। মানুষের হৃদয়গত প্রেম ঐকান্তিক আকর্ষণের জোরে জগতের বক্ষ হইতে অক্ষয় এবং অব্যক্তকে মানবীয় রূপ দান করিয়া উহাকে বরমাল্য দান করে। প্রেমের এই তত্ত্বকথাই এই কাব্যে বিশদ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 'স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে'কে কেহ কেহ শশাঙ্কমোহনের শ্রেষ্ঠকাব্য বলিয়া থাকেন। জনৈক সাহিত্যিক বলিয়াছেন যে, ইহা 'the finest love-story in the world.'

গদ্য-সাহিত্যেও তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ এবং অনতি-ক্রম্য। শুধু ভাষার স্বাধীনতা এবং প্রাঞ্জলতায় নহে, তিনি জগতের সভ্য সাহিত্যসমূহের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। আধুনিক সাহিত্যের নির্ভীক সমালোচকের ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়, সমালোচনা অর্থে নিন্দাবাদ বা প্রশংসা করা বুঝিতেন না, সত্য-শিব-সুন্দর-আদর্শের তুলনায় কতদূর যোগ্য হইয়াছে তাহা নিরূপণ করার কথাই তিনি বুঝিতেন। সাহিত্য-আলোচনায় তিনি প্রাচীন বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের সর্ব্বত্রের খবর দিয়াছেন। তাঁহার 'বঙ্গবাণী'র প্রতিপদই তাঁহার গভীর গবেষণা ও বিপুল অধ্যয়ন এবং চিন্তা-শক্তির সাক্ষ্য দেয়। 'বঙ্গবাণী' এবং 'মধুসূদন' তাঁহার সাহিত্য জ্ঞানের গভীরতা, ভাষার স্বাধীনতা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় মূলক বাংলা সাহিত্যের কোহিনূর। আধুনিক সাহিত্য মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদেশীয় সাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত। বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচয় না ঘটিলে আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা করিবার ক্ষমতা লাভ হয় না। শশাঙ্কমোহন সকল গুণ অর্জ্জন করিয়া 'বঙ্গবাণী'তে বঙ্গবাণীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'মধুসূদন'-এ তিনি মধু-কবির চূড়ান্ত আলোচনা করিয়াছেন। শশাঙ্কমোহন কবি বলিয়াই মধু-কবির সঠিক পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। আধুনিক সাহিত্যে দ্বিতীয় 'বঙ্গবাণী' আর রচিত হইবে কি না কে জানে! একা 'বঙ্গ-বাণী'ই গদ্য-সাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব্ব স্মারক হইতে পারিত। শশাঙ্কমোহন সাহিত্য-শাখার সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

তাঁহার দুইটি পদ্য কাব্য যন্ত্রাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার সর্ব্বশেষ এবং প্রধানতম কীর্ত্তিস্তম্ভ 'বাণী মন্দির'। ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সাহিত্যের ধারা এবং তাহার উপর বিশ্ব-সাহিত্যের প্রভাবের চিন্তা করিয়াছেন।

শুধু কাব্য-জীবনে নহে, বাস্তব জীবনেও শশাঙ্কমোহন

শৈশব হইতে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি সরল, অমায়িক, বিনয়ী এবং সতত প্রফুল্ল ছিলেন। যিনি একবার শশাঙ্ক-মোহনের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না।

সাহিত্যক্ষেত্রের এই অক্লান্ত ও সিদ্ধ সেবক জীবনের নাট্যমঞ্চে হঠাৎ অকালে যে যবনিকা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই শোকার্ত্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতেছেন। আমরা তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

গজল গান

(ভৈরবী—কাওয়ালী)

কথা, সুর ও স্বরলিপি—**নজরুল ইস্‌লাম**

এ আঁখিজল মোছ পিয়া, ভোলো ভোলো আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে ঝরে যে-ফুল আঁধারে॥
ফোটা ফুলে ভরি' ডালা গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে দেবে গো বল কারে॥
স্বপনের স্মৃতি, প্রিয়, জাগরণে ভুলিও!
ভু'লে যেয়ো দিবালোকে রাতের আলেয়ারে॥
ঝুরিয়া গেল যে-মেঘ রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তারে খোঁজ প্রাতে দূর গগন-পারে॥
ঘুমায়েছ সুখে তুমি, সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে সে ঘুমায়ে ওপারে॥
আগুনে মিটালি তৃষা, কবি, কোন্ অভিমানে,
উদিল নীরদ যবে দূর বন-কিনারে॥

II { সা -া -া ঋা | সাঃ ণ্ঃ ধ্া ণ্া I
{ ০ এ ০ আঁ | খি ০ জ ল

[দা পজ্ঞা
-া সা ঋা ণা | সা ঋা জ্ঞার -ার I
০ মো ০ ছ | পি ০ য়া ০

ঋা]
মজ্ঞঋসা সা ঋা ণ্া | সা ঋা জ্ঞার -ার I
০ ০ ০ ০ ভো ০ লো | ভো ০ লো ০

মজ্ঞঋসা সা মজ্ঞা ঋা | সা -া -া -া I}
০ ০ ০ ০ আ ০ মা | রে ০ ০ ০

[দা ণা ধা
{ -া সা পা পা | মপা ণদা পা -া I
{ ০ ম ০ নে | কে ০০ গো ০

ণা]
-াদ পা ণদা পা | মা পা মা -া I সা সা ঋা ণ্া |
০ রা ০ ০ খে | তা ০ রে ০ ০ ঝ ০ রে |

সা ঋা জ্ঞার -ার I মজ্ঞঋসা সা মজ্ঞা ঋা |
যে ০ ফু ল ০ ০ ০ ০ আঁ ০ ধা

সা -া -া -া I} II
রে ০ ০ ০

[জ্ঞা]
II { মা জ্ঞমা -া -া | মা -া ণদা ণা I
{ ০ ফো ০ টা | ফু ০ লে ০
{ ০ স্ব ০ প | নে ০ ০ র
০ ঝু ০ রি | য়া ০ ০ গে
০ ঘু ০ মা | য়ে ০ ছ ০
০ আ ০ শু | নে ০ ০ মি

র্সা র্সা -া -া | -া -া -া -া I ণা ণা -া -া |
০ ভ ০ রি | ডা ০ লা ০ ০ গাঁ ০ থ |
০ স্ম ০ তি | প্রি ০ য় ০ ০ জা ০ গ |
০ ল ০ যে মে ০ ঘ ০ ০ রা ০ তে
০ সু ০ খে তু ০ মি ০ ০ সে ০ কেঁ
০ টা ০ লি তৃ ০ ষা ০ ০ ক ০ বি

												[পা]	
র্সা	ণা	র্সাঋ	-া	I	ণা	ণা	-া	দা	পাদ	-া	-াদ	দমা	I }
বা	•	লা	•		•	মা	•	লি	কা	•	•	•	
র	•	ণে	•		•	ভু	•	লি	ও	•	•	•	
ত	•	ব	•		•	আ	•	ঙি	না	•	•	য়	
দে	•	ছে	•		•	জা	•	গি	য়া	•	•	•	
কো	•	•	ন্		অ	ভি	•	মা	নে	•	•	•	

[দা ণা ধা ণা পা ণদ]

{ -া	সা	পা	পা	পা	-া	পা	-া	I	-া	পা	দা	পা
•	দ	•	লি	ত	•	এ	•		•	ফু	•	ল
•	ভু	•	লে	যে	•	য়ো	•		•	দি	•	বা
•	বৃ	•	থা	তা	•	রে	•		•	খোঁ	•	জ
•	তু	•	মি	জা	•	গি	•		•	লে	•	গো
•	উ	•	দি	ল	•	নী	•		•	র	•	দ

মা	পা	মা	-া	I	সা	সা	ঋা	ণ্া	সা	ঋা	জ্ঞার	-া	I
ল	•	য়ে	•		•	দে	•	বে	গো	•	ব	•	
লো	•	কে	•		•	রা	•	তে	র	•	আ	•	
প্রা	•	তে	•		•	দূ	•	র	গ	•	গ	•	
য	•	বে	•		•	সে	•	ঘু	মা	•	য়ে	•	
য	•	বে	•		•	দূ	•	র	ব	•	ন	•	

মজ্ঞঋসা	সা	মজ্ঞা	ঋা	সা	-া	-া	-া	I } II
• • • •	ল	•	কা	রে	•	•	•	
• • • •	লে	•	য়া	রে	•	•	•	
• • • •	ন	•	পা	রে	•	•	•	
• • • •	ও	•	পা	রে	•	•	•	
• • • •	কি	•	না	রে	•	•	•	

নৈহাটি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার এল্ এম, এস্। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীটির অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থা। এত দিনেও বাঙালীর গর্ব্ব ও বাঙালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার কোনও আয়োজন সফল হয় নাই। উক্ত সম্মিলনীর সম্পাদক মজুমদার মহাশয় বঙ্কিমের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে নিবেদন করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক বাঙালীরই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। অনেক রাজকর্ম্মচারী বা বিদেশীয় সজ্জনের স্মৃতিরক্ষার্থ ভারতীয় ধনীবর্গ বহু অর্থ দান করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থাভাবে ভারতেরই এত বড় একজন লোকের স্মৃতিরক্ষার আজ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ আয়োজন হইতে পারিল না ইহা দেশের পক্ষে লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

'আমাদের বড় আকাঙ্খা অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় তাঁহার একটি স্মৃতি-মন্দির গড়িয়া তুলিব, একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিব এবং এই স্মৃতি-মন্দিরটিকে একটি সুবিশাল সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিব। এই আকাঙ্খাটি সাফল্যে সার্থক করিবার জন্য পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা বার্ষিক বঙ্কিম-সাহিত্যসম্মিলনের আয়োজন করিয়াছি। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মনীষী বিপিনচন্দ্র ও কুমার তুলসীচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বহু সুসন্তানকে আহ্বানও করিয়াছি। কিন্তু সে আকাঙ্খা বীজরূপেই রহিয়া গিয়াছে। কদাচিৎ অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, কিন্তু কবে যে তাহা ফলবান্ তরুরূপে দেখা দিবে তাহা কালিন্দী-বিহারী শ্যামসুন্দরই জানেন। গড়িবার মত আমাদের সে সাধনা নাই সত্য, কিন্তু দেশবাসীর সে উৎসাহ, সে সহানুভূতিই বা কই! আমরা বাঙালার প্রত্যেক সন্তানের নিকট আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা এই কার্য্যে উৎসাহ দিন, সহানুভূতি প্রকাশ করুন, কায়িক এবং আর্থিক সাহায্য করুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।'

এই প্রসঙ্গে আমাদের দুই একটি কথা মনে হইয়াছে। জীবিত অবস্থায় আমরা ত কাহারও কোনও সম্মান দিতেই পারি না, মরিয়া গেলে বরং অন্ততঃ একটা শোক-সভা করিয়া অথবা স্মৃতি-ভাণ্ডার খুলিয়া মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকি। যদিও অধিকাংশ ভাণ্ডারের থলিগুলি অপূর্ণই থাকিয়া যায়। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদের মনে হইতেছিল, দেশে যতগুলি পাঠাগার বা সাহিত্য-সংঘ আছে তাঁহারা সকলে নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে কিছুকাল এই স্মৃতি-রক্ষা-ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিলে বিশেষ উপকার হইবে। বিবিধ পাঠাগারের উদ্যোক্তা যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে স্থানীয় লোকের বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। নিজ নিজ গ্রামে বা সহরে পাঠাগারের সকল সভ্যের চেষ্টায় এই স্মৃতিরক্ষার জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। পাঠাগারসমূহের ইহাও একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কে কি ভাবে চেষ্টা করিলে অর্থ সংগ্রহের দিকে ফল বেশী হইবে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাঠাগার বা সংঘের উদ্যোক্তা ও কর্ম্মীগণ নিজেরা স্থির করিয়া লইতে পারেন।

শরৎচন্দ্র আমাদের গৌরব, কথা-সাহিত্যের ধারায় তাঁহার অপূর্ব্ব দান অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সমাজের চিন্তা-ধারায় তিনি নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত এই বাঙালা দেশেই ব্যাপক ভাবে শরৎচন্দ্রের কোনও সম্বর্দ্ধনা হয় নাই। শীঘ্রই শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি আসিতেছে। এই জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বৎসরে বৎসরে শিবপুর সাহিত্য-সংসদ হইতে একটি উৎসব হইয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ বিশেষ সাহিত্যসেবীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যে পাঠক-সমাজ তাঁহাদের পক্ষে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার কোনও সুযোগ আজও হয় নাই। আমাদের মনে হয়, আগামী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকতা সহরে কোনও সাধারণ স্থানে শরৎচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগ করা উচিত। কিছুদিন আগে হইতে জানাইলে হয় ত মফঃস্বল হইতে অনেকে আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করিতে পারিবেন। শিবপুরের সাহিত্য-সংসদ এ বিষয়ে উদ্‌যোগী হইয়া বাঙলার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে এই অনুষ্ঠানটির জন্য চেষ্টা করিলে কাজ সহজ ও সফল হইবে।

দেশের সাহিত্যের ধারায় যিনি যতটুকুই দিয়া থাকেন, তাহাই সাহিত্যের ধারাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। প্রকাশের দিক দিয়া ব্যক্তিবিশেষের দান কম হইলেও প্রত্যেক ক্ষুদ্র দানেরও একটা স্থান আছে এবং তাহা দেশ-বাসীকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেক সাধনার পশ্চাতে যে বিপুল চেষ্টা ও আগ্রহ থাকে তাহার ইতিহাস বাইরের লোক জানিতে পারে না।

শ্রীমতী বিণাপাণি রায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাঙলা-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদি প্রায়ই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত। কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি সঞ্জীবনী নামে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বীণাপাণি দেবী কলিকাতার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এন্, সি, রায়ের পত্নী এবং জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায়ের কন্যা ছিলেন। গত ৬ই মে, রবিবার বীণাপাণি দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেও তিনি আমাদের যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ যে 'আধুনিক সাহিত্য' লইয়া রুচিবিকার সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য বাহাদুরী লইতেছেন অনেকে। রাম, শ্যাম, যদু এক কলম আধুনিক সাহিত্যকে গাল দিয়াই মনে করিতেছেন দেশের কি প্রভূত কল্যাণই না জানি করিলেন। এই সমালোচকবৃন্দ আজ যাহা করিয়া রুচির নামে অরুচি ধরাইয়া দিয়াছেন, শ্রীমতী বীণাপাণি তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে তাঁহার নিজ তেজ ও শক্তিগুণে সর্ব্ব প্রথমে 'কল্লোল' পত্রে প্রকাশিত একটি গল্পের বিষয়বস্তু লইয়া 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় তীব্র আলোচনা করেন এবং সেই সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাহার পরে অবশ্য একই ব্যক্তির চেষ্টায় দিল্লীতে অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের নিন্দালোচনা ও সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রবন্ধের রচনা ও তাহার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

বীণাপাণি দেবী ভিন্ন ভিন্ন পত্রে লিখিয়াছিলেন—

দুই বৎসর পূর্ব্বে কল্লোলের একটি গল্প লইয়া আমি 'সাহিত্যে দুর্নীতি' শীর্ষক আলোচনা লিখিয়াছিলাম।

যে যতই নিন্দা করুক, কল্লোলের কবিতা এবং রচনা নির্ব্বাচন যে প্রথম শ্রেণীর এ কথা মুখে না হোক্, মনে মনে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যার কল্লোলের গল্প 'সাহিত্যিক-সংহতি', কবিতা—'মহাকাল', 'পাকাধানের বিদায়' 'বাস্তু' 'সুরের দুলাল'—রচনা-বৈচিত্র্যে এক একটি রত্নে পরিণত হইয়াছে।

আমার মনে অনেক আশা ছিল, কল্লোলের দ্বারা সাহিত্য-সমাজে আমি পরিচিতা হইব।

কল্লোলের অধিকতর উন্নতির জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর বিধাতার বিধানে ঘটিয়া যায় অন্যরূপ। আমার একটি পুত্রের হঠাৎ সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে। ...জানি না আমার অদৃষ্টে কি আছে। যদি সে আরোগ্য লাভ করে তাহা হইলে আপনার কাছে আবার পত্র লিখিব, নচেৎ এই পর্য্যন্তই আমার সাহিত্য-সাধনার শেষ।

বীণাপাণি পুত্রের অসুখের জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন কিন্তু কে জানিত, এই সাধনলোক হইতে তাঁহাকেই আগে বিদায় লইতে হইবে! সাহিত্যে যেখানে অন্যায় হইয়াছে বোধ করিয়াছেন, সেখানে বীণাপাণি তেজের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা করেন নাই, আবার যেখানে সুন্দর ও সত্য কিছু দেখিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে তাঁহার আগ্রহ কম ছিল না। পত্রগুলি পড়িলে এই কথাই মনে হয়।

শেষ পত্রে তিনি লেখেন—

... আমি আবার অসুখে পড়িয়াছি। ... মাঝে মাঝে বাড়ে আবার কমিয়া যায়। সম্প্রতি আবার বাড়িয়াছে। ...মনে অনেক আশা ছিল, কিন্তু কিছুই সফল হইল না বা হইবে না। কারণ ব্যাধির প্রকোপে আশালতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।... মনে যাহা থাকে, সংসারচক্রে পড়িয়া সকল সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায় না: এই ক্ষোভই মনে চিরদিন রহিয়া গেল। ... সাহিত্যিকের স্মৃতির জন্য যে দান, তাহা আরও উচ্চতর হওয়া উচিত—কারণ সাহিত্যিকগণ আমার পূজার পাত্র।

বীণাপাণি দেবীর অকাল মৃত্যুতে আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি ও তাঁহার আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

এ বৎসরে আরও দুই চারিখানি মাসিক পত্র বাহির হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হয় প্রত্যেক পত্রিকারই মূল্য-হিসাবে উদ্যোক্তাগণ নিজেদের সাধ্যাতীত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ তিনখানা, কেহ দুইখানা করিয়া বহু বর্ণের চিত্র দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। আমাদের দেশে রঙীন ছবিরই আদর বেশী হইয়াছে দেখা যায়। তাই সাধ্যের অতীত হইলেও সকলেই বাজার বুঝিয়া রঙীন ছবি দিবার চেষ্টা করেন। মোটামুটি দেখা যায়, ছবির বিষয়-বস্তু যাহাই হউক না কেন, অঙ্কন-চাতুর্য্য যতটুকুই থাকুক না কেন, ছবি রঙীন হইলেই তাহার ভারে কাগজ কাটিয়া যায়। ইহা দেশের লোকের চিত্র-শিল্পের প্রতি অনুরাগের পরিচয় কি না তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। ছবির প্রতি প্রীতি ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ এক জিনিষ নয়। তাই দেখা যায় অনেক সময় প্রেয়কে ঘুষ দিতে গিয়া শ্রেয়কে উপেক্ষা করিতে হয়। এরূপ অনেক ছবি প্রকাশিত হয় যাহা কুরুচির পরিচায়ক। কেবল বিষয়-বস্তু নহে, অঙ্কন-পদ্ধতিতেও গ্রাহকবর্গের রুচির নাম করিয়া পত্রিকার পরিচালকবর্গ এই সকল ছবি ছাপেন। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এরূপ ছবি না দিলে কাগজ কাটে না। কাগজ কাটাটা যেমন দরকার, কি দিয়া কাগজ কাটাইতেছি

তাহাও ভাবা দরকার। ছবির ভিতরে কেবল বিষয়-বস্তুটিই বড় নয়, তাহার সৌষ্ঠব, ব্যঞ্জনা, ভাব ও অঙ্কনসাফল্য ছবিকে বড় করে। সেরূপ ভাবে ছবির বিচার করিয়া খুব কম পত্রিকাই ছবি ছাপেন। এমনও দেখা যায়, কেবলমাত্র রঙীন ছবি দিবার মোহে অনেক পত্রিকা বহুবার প্রকাশিত অতি বাজে ছবিও ছাপিয়া থাকেন। তাহাতে ব্লক তৈয়ারীর খরচ লাগে না। অথচ রঙীন ছবি দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গকে এত রুচিজ্ঞানহীন মনে করিবার কারণ কি? ভাল জিনিষ দিলে তাঁহারা তাহার মূল্য বুঝিবেন না এ কথা শুনিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। সাধারণের রুচি কদর্য্য ও ছবি ভাল কি মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা নাই এই অজুহাত ধরিয়া রঙীন হইলেও বাজে ছবি যাঁহারা ছাপেন তাঁহারা দেশের চিত্র-শিল্পের প্রতি, শিল্পীর প্রতি ও দেশের লোকের শিল্পজ্ঞানের প্রতি অবিচার করেন।

———

মাসিকপত্রে ছোট গল্প খুব চলে। কিন্তু ছোটগল্পের বই বাজারে একেবারে চলে না। যাঁহারা ছোটগল্প লেখেন তাঁহারা এ কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। সাময়িক পত্র ঠিক যতখানি সমাদরে ছোটগল্প প্রকাশার্থ গ্রহণ করেন, ঠিক ততখানি অবহেলা ভরেই আমাদের পুস্তক-প্রকাশকগণ ছোটগল্পের বই ফিরাইয়া দেন্। তাঁহারা বলেন, উপন্যাস হইলে বাঙলা বই তবুও কিছু কাটে কিন্তু ছোটগল্পের বই একেবারে কাটে না। অথচ দেখা যায়, সাময়িক পত্রের পাঠক যাঁহারা, তাঁহারাই উপন্যাস প্রভৃতির শ্রোতা। প্রকাশক বলেন, তাঁহারা ছোটগল্পের বই কেনেন না। এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইতেছে যে, ছোটগল্প না ছাপিলে সাময়িক পত্র চলে না, আর লেখক ছোটগল্প লিখিলে একবার মাত্র কোনও সাময়িক পত্রে উহা ছাপানো ছাড়া আর কোনও কাজে আসে না। এই কারণে, যাঁহারা গল্প লেখায় একটুও হাত পাকাইয়াছেন তাঁহারা উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপন্যাস হইলে অন্তত কিছুও মূল্য পাওয়া যায় এই ভাবিয়া, যাঁহাদের গল্প লেখায় এখনও হাত পাকে নাই তাঁহারাও উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মূলে একটি কথা, ছোটগল্পের ভিতর যে একটি সমগ্রভাব অল্প আয়তনের মধ্যে এত সুকৌশলে বিন্যস্ত হয় তাহা পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়া দেখেন না। একখানি সমগ্র উপন্যাস লেখা যত কঠিন, একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প লেখা তাহা অপেক্ষা কম কঠিন নয়। উপন্যাসের স্থান বিস্তৃত, তাই বহু চরিত্র ও তাহার বিশ্লেষণ তাহাতে সম্ভব হয়। ছোটগল্পে স্থান অল্প, তাই চরিত্র-সৃষ্টি অল্প এবং প্রত্যেক চিত্র ও চরিত্র সম্যক ও সমগ্রভাবে অল্প কথায় ব্যক্ত হয়। দেশ, জাতি, সমাজ বা ব্যক্তির চিন্তার ধারা যেমন উপন্যাসে পর্য্যবসিত, ছোটগল্পেও তেমনি। কিন্তু ছোটগল্প পড়িতে সময় কম লাগে তাই তাহাকে সম্যক শ্রদ্ধা না দেওয়া আমাদের স্বভাব হইয়া গিয়াছে। উপন্যাসে যে পরিণতির স্থান আছে ছোটগল্পে তাহা উহ্য থাকে। সেইজন্যও ছোটগল্প ছোট বলিয়া যতটা উপেক্ষা পাইবার তাহা পায়। কিন্তু কেবলমাত্র আকারে বড় হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া অনেক অযোগ্য উপন্যাস ছোটগল্প অপেক্ষা সমাদর বেশী পায়। কিন্তু আমাদের পাঠক-সমাজ যদি ছোটগল্পের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট প্রীতি ও শ্রদ্ধা না দেখান, তাহা হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই এমন অবস্থা হইবে যে, সাময়িক পত্রিকায় ছোটগল্প ছাপিতে হইলে অত্যন্ত অক্ষম রচনাই কেবল ছাপিতে হইবে অথচ সাময়িক পত্রের পাঠকবর্গের কাছে ছোটগল্পের চাহিদা কিছু কমিবে না। অথচ মাসিক বা অন্যান্য পত্রে যে সকল ধারাবাহিক উপন্যাস বাহির হয় তাহা ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যেক বার পড়েন এমন পাঠক কম। কাজেই শুধু উপন্যাস দিলেই সাময়িক পত্র চলে না, চলিবে না। এ অবস্থায়, সাময়িক পত্রে যাহা প্রকাশিত হয় সেই সব ছোটগল্প পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তাহার প্রতি আমাদের দেশের পাঠকবর্গের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর্ত্তব্য হইবে। একখানি ছোটগল্পের বইতে গল্প-সংগ্রহের ভিতর যে বিচিত্রতা ও ঘটনা-সমাবেশ উপভোগ করা যায় অনেক উপন্যাসেও বোধ হয় তত অধিক পরিমাণে উপভোগ্য বিচিত্রতা ও ঘটনা-বিন্যাস থাকে না। অক্ষম লেখকের হাতে পড়িয়া ছোটগল্প বা উপন্যাস একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কাজেই গল্প ছোট বা বড় বলিয়া তাহার আদর না হইয়া ছোট হউক বড় হউক, গল্পের রস ও ব্যঞ্জনারই সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে পাঠকবর্গ সাময়িক পত্রেও সুখপাঠ্য ছোটগল্প পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন এবং উপন্যাসগুলিও ভাল পাইবেন।

———

'এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর পরে—'

কিন্তু যে রবির যশঃকিরণে যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিদূরিত হইয়া ধরণীর মুখ সমুজ্জ্বল, এই বিশেষ দিনে তাঁহাকে কাছে পাইয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্য এ বৎসর কলিকাতাবাসী পাইয়াছে।

গত ২৫-এ বৈশাখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিচিত্রা-গৃহে বিশ্ব-ভারতী-সম্মিলনীর তত্ত্বাবধানে কবির জন্মতিথি-উৎসব দেশীয় প্রথা অনুযায়ী গভীর শ্রদ্ধা ও একান্ত নিষ্ঠার সহিত

সম্পন্ন হইয়াছে। পুরনারীগণের শুভ শঙ্খধ্বনির দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন সূচিত হইলে সকলের শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যে কবি আসন গ্রহণ করেন। ক্রমে বেদগান, স্বস্তিবাচনের সহিত কবিকে পুষ্প-চন্দন-মাল্য-অর্ঘ্যে ভূষিত করা হয়। কবি ও কাব্য, স্রষ্টা ও সৃষ্টির তুলনায় কবিই যে জয়ী হইলেন তাহা বলাই বাহুল্য।

পুরোভাগে সুবেশা পুরস্ত্রী ও বৈতালিকগণ, মধ্যভাগে সুচিত্রিত মাঙ্গলিক আলিম্পণের মধ্যে শ্বেত ও রক্তপদ্মের শোভা, চতুর্দ্দিক ধূপ ধূনা, পুষ্প-চন্দনের সুবাসে আমোদিত, পশ্চাতে পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত সুদৃশ্য এক তুলাদণ্ড—ইহারই মধ্যস্থলে ভারতীয় রীতি অনুযায়ী গৈরিক কাষায়-বস্ত্রোত্তরীয় পরিহিত পুষ্পমাল্য-চন্দন-চর্চ্চিত কবি ধ্যান-সমুজ্জ্বল মুখে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত অবস্থায় সমাসীন। মনে হইতেছিল যেন কতদিনের ভুলিয়া যাওয়া নিজস্ব একটি অতিপ্রিয় পুরাতন ছন্দ আজিকার এই বিশেষ দিনে মনের কোণে ধরা দিয়াছে। তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার আব্-হাওয়ায় হেলায় হারাইয়া ফেলা আমাদেরই অতীতের যেন একটি মধুর করুণ-সুর সকলের হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া বারে বারে আঘাত করিতেছিল।

বলা বাহুল্য, উৎসবের প্রারম্ভেই অভ্যাগত সকলকে মাল্য-চন্দন এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতির দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও নারী অনেকেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার, শ্রীমতী সাহানা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর অধিনেত্রীত্বে বৈতালিকদল এবং কবি স্বয়ং সুললিত সঙ্গীত ও আবৃত্তি দ্বারা সকলকে অভিনন্দিত করেন।

পুস্তক-পরিচয়

মরুশিখা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—মূল্য পাঁচ সিকা। প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী ১০।১ আরপুলি লেন, কলিকাতা

জীবনকে দেখিবার মাত্র একটিই বিশেষ দৃষ্টিকোণ নাই। কেহ হয় ত সৃষ্টির অন্তরে একটি অপূর্ব্ব আনন্দের উৎস দেখেন। কাহারো কাছে বা হয় ত এই সৃষ্টি একটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতারূপেই প্রতিভাত হয়। কেহ হয় ত একমাত্র ফুলটুকুই দেখেন, কারো চোখে বা তার কাঁটাটাই বড় হইয়া দেখা দেয়। এবং যে ঐ কাঁটা নিয়াও সত্যিকারের সাহিত্য-রচনা করিতে পারেন তাঁহার কৃতিত্ব অপরিসীম।

দেখিবার ভঙ্গির মধ্যে যে একটি বিশেষ অভিনবত্ব থাকিতে পারে কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মরীচিকা' ও 'মরুশিখায়' তাহা সার্থকরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মত অনুকরণে মত্ত হইয়া নিজের বিশেষত্বটুকু বর্জ্জন করেন নাই,—তাঁহার মধ্যে একটি অভূতপূর্ব্ব মৌলিকতা আছে। এবং এই বিশেষত্বটুকু যে তিনি শুধু অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা নহে, সুপ্রতিষ্ঠিতও করিয়াছেন।

তাঁহার কবিতায় অপূর্ব্ব সুন্দর একটি ভঙ্গী আছে। এবং এই ভঙ্গীটিকে ভর করিয়াই তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলার কাব্যের ক্ষেত্রে এই ভঙ্গীটিই তাঁহার নিজস্ব দান।

জীবন সম্বন্ধে তাঁহার philosophy খুব বড় কি না তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই,—কেন না তাঁহার কবিত্বটাই বড় কি না সেটাই জিজ্ঞাসার বস্তু। এবং সেই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়ই খুব অনুকূল বলিয়া মনে করি। তিনি রসাভাসের উদ্বোধন করিতে গিয়া মাঝে মাঝে যে রসসঙ্কয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তাঁহার এই কাব্যখানিতে কতকগুলি শ্যামা বিষয়ক গান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'মরুশিখার' কবিতাগুলির একটানা সুরের মধ্যে এই গানগুলি একটা বৈচিত্র্য আনিয়া থাকিলেও অশোভন হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

পদ্মরাগ—মিসেস্ আর এস্ হোসেন প্রণীত, ৮৬ এ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা; মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

বাংলা মুসলমান সমাজে দিন দিন তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই অনুরাগ এখনও ব্যাপ্ত হইয়া বিশেষ একটি অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টিতে সুপরিণত না হইলেও যে একটি চেষ্টা ও সাধনার যুগ চলিয়াছে তাহা আশার বিষয়।

মুসলমান মহিলার এই সুখপাঠ্য উপন্যাসখানি সেই সাধনারই সম্যক পরিচয় দিতেছে। লেখিকার ভাষা বর্ণনা-বাহুল্যে ভারাক্রান্ত নহে। তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ত্যাগ করিয়া নিজের অবান্তর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ,—মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

—অ

Published by Sj Dineshranjan Das from 10-2 Patuatola Lane, and Printed at the Rahasya Lahari Press, 2A Akrur Dutt Lane, Calcutta.

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস,

১০।২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল

শেলী

MOHILA PRESS, CAL.

ষষ্ঠ বর্ষ
আষাঢ়, ১৩৩৫

গজলগান

(সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী)

নজরুল ইস্‌লাম

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে।
ঝরিল যে ধূলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবেলায় পড়ে তারে মনে॥

তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরিত ডালা নিতি নব ফুলে,
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে॥

আঁখি-জলে ভাসি' গাহিত উদাসী
আমি শুধু হাসি' আসিয়াছি ফিরে,
(আজি) সুখ-মধুমাসে তুমি যবে পাশে
সে কেন গো আসে কাঁদাতে স্বপনে॥

কার সুখ লাগি' রে কবি বিবাগী
সকল তেয়াগি' সাজিলি ভিখারী!
(তুই) কার আঁখি-জলে বেঁচে র'বি ব'লে
ফুলমালা দ'লে লুকালি গহনে॥

—০—

চব্বিশ ঘণ্টা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বিনা টিকিটের যাত্রী—তায় আবার জাহাজের ডেক-প্যাসেঞ্জার! সোনায় সোহাগা।

নিজের সঙ্গে কতটা পরিচয় হয়েছিল জানি নে, কিন্তু এ কথা মনে আছে দুর্ভোগের আর অন্ত ছিল না সেদিন।

বলি তবে।

ডিঙি থেকে লাফিয়ে যখন জাহাজের ঝোলা-সিঁড়িটা ধরে ফেললাম—জাহাজ তখন একটু একটু চলছে। সাড়ে দশটা বেলা হবে।

উঠলাম গিয়ে ডেকের ওপর। কাজটা ঠিক সাধুর মত হয় নি। টিকিট ফাঁকি দেবার হয়ত একটা অচেতন ইচ্ছা ছিল।

খালাসীরা দাঁড়িয়ে ছিল,—তারা ত অবাক। চলন্ত জাহাজে মানুষ উঠলো কেমন করে' এ তাদের ধারণা হল না। কিন্তু চাটগেঁয়ে মগের রক্ত গরম হয়েই আছে। কাছে এসে হাত ধরে ফেলে বললে—চোর কাঁহাকা,—টিকিট কই?

হাত ছাড়ো, চোর আমি নই।—বললাম।

হাত ছাড়লে বটে কিন্তু রক্তচক্ষে সকলে তেমনি সমস্বরে বললে—টিকিট?

নেই। সময় ছিল না টিকিট কাটবার।

আবার হাত ধরলে। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। কথোপকথনের কি অপূর্ব্ব অশ্লীল ভাষা তাদের। কিন্তু ওই নাকি ওদের মাতৃভাষা!

বন্দীভাবে অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে হল বটে। শেষে কাপ্তেনের কেরাণীর কাছে নিয়ে গেল। জাহাজ তখন বেশ চলছে।

লোকটি ভারি মজার। চেহারাটিও। সাদা চুল আর সাদা গোঁফ জোড়াটির মাঝখানে কালো দুটি ভুরু। চোখে চশমা। বেঁটে।

তকমা পরা খালাসীটা কি বললে জানি না—লোকটি হঠাৎ দাঁতে দাঁতে কামড়ে কাছে এসে ইংরেজিতে বললে—তোমায় আমি ফাঁসী দেবো।

সত্যিই ভয় পাবার কথা। কাঁপতে কাঁপতে বললাম—কেন?

আরক্ত চোখে সে বললে—তোমাদের সমস্ত যুবক জাতির প্রতি আমি এই ব্যবস্থা করতে চাই।

বাপ্‌রে!—বললাম—টিকিটের টাকা আমার সঙ্গেই আছে মিষ্টার, যদি চাও ত—

টাকা! ... চোর নও তুমি তাহলে?—বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে সে আবার বললে—ছি ছি, আমি ভেবেছিলাম তুমি দুঃসাহসিক, শ্রদ্ধাও একটুখানি সে জন্যে হয়েছিল—

বললাল—লোকে বুঝি শ্রদ্ধা করে ফাঁসী দেয়?

লোকটি একটুখানি হাসলে; পরে চোখ টিপে খালাসী-গুলোকে সরিয়ে দিলে। তারপর বললে—দুঃসাহসিক হয়ে যারা ধরা পড়ে, ফাঁসীই তাদের শাস্তি; অপরাধের জন্য নয়,—ধরা পড়ার লজ্জার জন্য। কিন্তু তুমি! দুর্ব্বল কাপুরুষ বাঙালি জাতি, তোমার ওপর দয়া হয়!

তার ওজস্বিনী বক্তৃতার জন্য মনে মনে হাত-তালি দিয়ে বললাম—টাকা কটা কি এখনই দেবো?

প্রশ্নটা চেপে রেখে সে বললে—বসো।

ছোট্ট কেবিনটির একধারে খাটের ওপর ধব্‌ধবে বিছানা পাতা। ময়লা কাপড়-জামা পরে বসতে লজ্জা করে। তা ছাড়া আরও যে একটা মুস্কিল! ইংরেজি ভাষাটা যে আবার ভাল জানি না,—মানে-মানে বিদায় হওয়াই ত এখন ভাল!

বললাম—আমার ওপর দয়া হয় কেন?

সে বললে—টাকা দিয়ে তোমার এই সাধু সাজবার অভিনয় দেখে।

তাড়াতাড়ি বললাম—অধর্ম্মের দুঃসাহস দেখিয়ে আমরা কোথাও বাহাদুরি নিতে চাই না—বুঝলে সায়েব?

আমরা চাই!—সায়েব সগৌরবে বললে—শ্রেষ্ঠ সাধু আর শ্রেষ্ঠ চোর আমাদের দেশে সমানই সম্মান পায়,—এর মধ্যে আমাদের জাতির একটা মস্ত বড় 'আইডিয়া' আছে। পরাধীন জাতির মন নিয়ে তোমরা এর রস বুঝবে না।

ধন্যবাদ।—বেরিয়ে আসছিলাম সে বলে উঠলো—তুমি আমার বন্দী, তা জানো?

একবার তার মুখের দিকে চেয়ে ভেতরের পকেট থেকে কয়েকখানি নোট বার করে তার কাছে রেখে দিলাম। এক টাকার নোটের তখন খুব চল্‌তি।

ঘুরতে ঘুরতে একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে ডেক-এর এক কোণে গিয়ে বসে পড়লাম। কদিন আহার নেই তার ওপর তাড়সে জ্বর,—মাথার মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ডিঙিতে জল উছ্‌লে পড়ে জামা-কাপড় ভিজে গিয়েছিল,—হাওয়া লেগে এতক্ষণে টের পেলাম।

বার-সমুদ্রে পড়ে জাহাজ তখন পূর্ণ গতিতে ছুটে চলেছে। দুলচে, হেলচে—যেন মাতাল। সূর্য্যের প্রখর আলোয় সমস্ত সমুদ্র তখন গাঢ় নীল হয়ে উঠেছে। কটা বেজেছে জানি না; ঘড়িটা বিক্রি করেছি। সমুদ্র দেখবার জন্য একটা 'বায়নেকুলার' এনেছিলাম,—সেটাও গেছে বিক্রমপুর।

পকেটে একখানা পাঁউরুটি আছে; কিন্তু কে বার করে, কেই-বা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়—

জ্বরে কাঁপছি তখন—। বিকারের স্বপ্ন চোখে ছায়া ফেলেছে।

কপালের ওপর স্পর্শ পেয়ে চোখ খুললাম। চেয়ে দেখি, সেই কালো ভুরু আর সাদা গোঁফ ফিরিঙ্গী। বললাম—ডাকলে কেন?

সে একবার দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। বললাম—টাকা যা ছিল দিইছি, আর কিছু নেই আমার।

কিন্তু তার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের দিকে ফিরে অবাক হয়ে গেলাম। চিম্‌নির তলায় শুয়ে আছি, এতক্ষণ খেয়াল হয় নি। দেখি—সর্ব্বাঙ্গে ভুসো পড়ে একেবারে কালো হয়ে গেছি। গা-মাথা জামা-কাপড় বিশ্রী হয়ে উঠেছে।

সায়েব বললে—টাকার দরকার যদি থাকত তাহলে খালাসীকে দিয়ে তোমায় টেনে নিয়ে যেতাম। বুঝলে?

তাড়াতাড়ি উঠে সে চলে গেল। একবার ডাকলাম কিন্তু সে আর ফিরেও চাইলে না। কেনই বা এল আর গেলই বা কেন অমন করে!

এতক্ষণে মনে হল—কপালে তার সেই হাতের স্পর্শটুকুর মধ্যে হয়ত ঠিক দেনা-পাওনার তাগাদা ছিল না! ছিল হয়ত অন্য কিছু!

কিম্বা এমনিই হয় বুঝি। রোগশয্যায় মানুষের আরামের কল্পনা হয়ত বা এমনি কাঙাল হয়ে ওঠে! যা অসম্ভব, যা সত্যি সত্যিই হতে পারে না,—তাকেও মধুর করে ভেবে নেয়।

চোখ বুজে শুয়ে আছি; এত জ্বর যে ভেতর থেকে একটা বমির বেগ আসচে ··· সর্ব্বাঙ্গ যে ভুসোয় ছেয়ে গেছে —কি করে সাফ্ করব, সেও এক চিন্তা···

বাবু সাব্?

চোখ খুললাম। মুখের ওপর খালাসী একটা ঝুঁকে পড়েছে। ইচ্ছে হল ওর কান দুটো মলে দিয়ে বলি, ডাকচ কেন? উত্তর দেবার শক্তি যে আমার নেই।

বললে—কেরাণী সাহেব ডাকচেন তোমা—আপনাকে।

আবার? বলগে সে আসবে না—যাও।

কিন্তু এক বার যদি যেতেন তা হলে—

আঃ—যাও না তুমি এখান থেকে?

আবার চোখ বুজে অনুভব করলাম, লোকটার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।—যাক্।

পাঁউরুটিখানা এবার বার করতে হল। চার পয়সার রুটি অন্তত চব্বিশটি ঘণ্টা চলা চাই। অতি যত্নে চার ভাগের এক ভাগ ছিঁড়ে মুখে পুরলাম। পাঁউরুটি যে এত সুস্বাদু তাও যেমন এর আগে জানতাম না, আমিও যে এত তাড়াতাড়ি খেতে পারি—এও অজানা ছিল।

তবে চার ভাগের এক ভাগ—এতটা এখনও খাই নি।

আর একটু ছিঁড়লাম। কিন্তু এত বড় রুটিখানার এক-চতুর্থাংশ কি এতই অল্প?—আরও খানিকটা ছিঁড়ে খেলাম।

আর নয়, এবার মাত্রা বেশি হয়ে যাবে। ভোজ্য বস্তুটি মুখের ভেতর নাড়ছিলাম, গিল্‌তে মায়া হচ্ছিল।

কিন্তু ওই ও? ওর মনোগত অভিপ্রায়টা কি? সকাল বেলা আজ পোরবন্দর থেকে জাহাজে উঠেছে। সমস্ত জাহাজের সঙ্গে যেন ঘনিষ্ঠ পরিচয়। নিরিবিল চন্‌মন্ করে ঘুরে বেড়ায়,—ঘুরে বেড়াবার সে কি নকুলে-ভঙ্গী!

বলছি ক্রমশ—

যা ভাবলাম তাই। ঠিক আলাপ করলে। মাথার ছেঁড়া টুপিটি নেড়ে বললে—শুভদিন! তোমাকেই যেন খুঁজছিলাম—

কী ওর হাসি! যেন জীবনে প্রথম হাসলে।

অবাক! কি আদব-কায়দা লোকটার! ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতেই আলাপ করলে বটে,—যতই ভিড় হোক না কেন, ঠিক খুঁজে বার করতাম তোমাকে।—একা নাকি? এদিকে কদ্দূর?

বম্বে।—বললাম।

নিঃশব্দে হাসলে—যাত্রা তবে একই? বেশ।—মুরুব্বির মত হঠাৎ পিঠ চাপ্‌ড়েও দিলে।

পিঠ চাপড়ানি সহ্য করা অভ্যাস ছিল। ভাল করে কিন্তু এবার ওকে দেখে নিলাম। চুলে বেশ পাক্ ধরেছে। বয়স আর এমন কি—বড় জোর পঞ্চাশ। দাড়ি-গোঁফ নেই। আর পোষাক-আসাক্!!

রসিক লোকে হাসি চাপতে পারে না!

··· গায়ে যেন একটা দর্জ্জির দোকান ঝুল্‌চে। পুরু কম্বল থেকে দামি সিল্কের ছাঁট্‌-কাটটুকু পর্য্যন্ত জোড়া-তালি দিয়ে অপরূপ আল্‌খেল্লা তৈরী হয়েছে। তার অনেক-খানি অংশ ময়লা—অনেকখানি সাবান-কাচা মনে হল।

বললে—করাচি থেকে আসচি, ইস্কুল মাষ্টার ছিলাম ওখানে। পথে পোরবন্দরে নেমে দিন তিনেকের জন্যে ··· তারপর ত আবার জাহাজ ধরলাম তোমার সুমুখেই।

একটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। মাষ্টার বললে—ওই যা, দেখেছ ভাই আমার মনের ভুল! আসছি—তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে সেও 'হোল্ডের' সিঁড়িতে গিয়ে নামলো।

লোকটা যেন মূর্ত্তিমান কৌতূহল!

এমনিই এক একটা লোক থাকে; সংসারে এরা কোনো কাজ নিয়ে আসে নি। মাটির ওপর শুধু শুধুই চড়ে বেড়ায়। পৃথিবীর কাছে দেনাও নেই—পাওনাও কিছু নেই। নিজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে একেবারে দেউলে হয়ে বসেছে।

ওদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যাহ্ন ভোজনের তাগিদে সুসজ্জিত 'সার্ভার'গুলো ডিস হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করছে। কাপ্তেন সায়েব সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে শিস্ দিতে দিতে ওপর থেকে নেমে এলেন। ডেকের অন্যান্য যাত্রীরা ঝোলা-ঝুলি খুলে বসলো। এক ধারে একটা ফেরিওলাকে ঘিরে কতকগুলি দেশী বিলাতী মেয়ে নারেঙ্গীর দর কসাকসি করছে। সকলের পায়েই ঘুন্টি বাঁধা জুতো, হাঁটু অবধি ফুল-মোজা আর তার উপরেই গলা পর্য্যন্ত ঘাঘ্‌রা আঁটা। মেয়েগুলি সবই যুবতীর পর্য্যায়ভুক্ত, তবুও বুকের কাছে ঘাঘ্‌রার কাপড় নেই। না থাক্—কেউ তার জন্য দুঃখিত নয়।

অকস্মাৎ যে ওদের আব্‌রু রক্ষা হয়েছে,—এই খুব!

জ্বরের যন্ত্রণায় মাথার ভেতর একেবারে অচেতন। তন্দ্রা এসেছিল। অতি যত্নে পাঁউরুটিখানির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে নিজের শিথিল হাতখানি কখন্ যে থেমে গিয়েছিল তা বুঝতেই পারি নি।

আবার কেমন করে ঘুম ভেঙ্গে গেল। নাগর-দোলার মত জাহাজটা দুল্‌চে। জলের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়।

কিন্তু—এঃ! এ লোকটা যে ভারি ন্যাওটো দেখতে পাই! সেই সাদা গোঁফ আর কালো ভুরু! এবারে আমাকে ডাকতে বা কাছে এসে বসতে সাহস হয় নি বুঝলাম। এও বুঝলাম—একান্ত দৃষ্টিতে সে এতক্ষণ আমারই দিকে চেয়ে ছিল। লোকটা মাথা-পাগ্‌লা নাকি?—হাসলাম একটু।

চটে গেল; বোধ হয় হাসিটা দেখতে পেয়েছিল।

কাছে এসে হাত নেড়ে উত্তেজিত হয়ে বললে—সমস্ত জাহাজটাই আমার, তা জানো?

এবারেও না হেসে উপায় কি! বললাম—ভালই ত!

গরম হয়ে বললে—বিনা টিকিটে জাহাজে চড়েছ, তোমাকে যা খুসি তাই করতে পারি। আমার এখানে প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তির কথা শুনলে তুমি থর্ থর্ করে কেঁপে উঠ্‌বে, তা জানো?

বললাম—রাগচ কেন? কি বলতে চাও বল না?

তুমি যে আমার নজর-বন্দী, বার বার এ কথাটা তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই।—বললে।

উত্তেজিত হয়ে বললাম—যেমন ভাবেই মনে করিয়ে দাও না কেন, টিকিটের দাম যা দিইছি তার ওপর একটি পয়সা বেশি ঘুষ দিতে পারব না।

ঘুষ? ঘুষ চাই আমি তোমার কাছ থেকে?—অকস্মাৎ লোকটা যেন পাথর হয়ে গেল। মুখে আর কিছু বললে না, পকেট থেকে আমার দেওয়া সেই নোট কখানি বার করে স্থমুখে নামিয়ে দিয়ে বললে—মানুষকে তুমি এমনি অপমান করতে পারো?

বললাম—অসহায় পেয়ে তুমিও ত আমায় ছেড়ে দিচ্ছ না! নজর-বন্দী করে রাখা যে কতখানি অপমান—স্বাধীন জাতি হয়ে তোমরা হয় ত সেটা বুঝবে না।

আশ্চর্য্য! লোকটার সমস্ত আগুন হঠাৎ নিবে গেল। কাছে এসে হাত ধরে বললে—ক্ষমা চাইবার আমার প্রয়োজন ছিল না। মানুষের সকল কথাই যে মনের কথা হবে এমন কোনো যুক্তি নেই। স্বার্থের চেয়ে মনের তাগিদ যে কত বড় তা বোধ হয় তুমি জানো।

তারপর আলাপ হয়ে গেল।

গায়ের ওপর হাত রেখে আস্তে আস্তে বললে—বাঙালীর ছেলে হয়ে রঙ্ তোমার এত ফর্সা!—আচ্ছা, ভগবানের রাজ্যে দুটো লোক ঠিক এক রকম দেখতে, এমন হতে পারে?

অনেকটা হতে পারে বটে।

অনেকটা—না? ঠিক বলেছ।—লোকটা মুখ ফিরিয়ে সাগরের গভীর কালো জলের দিকে চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। তার সেই স্বপ্নভরা দৃষ্টি যেন এই জাহাজ, সমুদ্র, আকাশ—সব কিছু ছাড়িয়ে কোথায় চলে গেছে!

খানিক পরে মুখ ফিরিয়ে আবার বললে—তোমার কটা চুল, কচি মুখে ওই বসন্তর দাগ, তোমার জোড়া ভুরু,—এমন কি তোমার এই একা পথ-চলার সাহস সবই আমার ভাল লাগচে।

হেসে বললাম—তোমার এ হেঁয়ালি কিছু বোঝবার জো নেই, সায়েব।

সায়েব সে কথা শুনলে না। সাগরের দূর প্রান্তরেখার দিকে তেমনি দৃষ্টি মেলে বললে—দুর্জ্জয় সাহসে সেও একদিন এমনি জাহাজে করে কোথায় চলে গেছে, আজও তার সন্ধান মেলে নি।

আভাসে বুঝলাম নিজের ছেলের কথাই বলছে।

হঠাৎ কপালের ওপর হাত রেখে বললে—জর কি তোমার একটু কমে নি? খেয়েছ কিছু? সে ত' দেখতেই পাচ্ছি মুখে জলটুকু পর্য্যন্ত পড়ে নি। ওকি—ও বাসি পাঁউরুটি কি হবে—ফেলে দাও, এক্ষুনি ফেলে দাও। আমি এনে দিচ্ছি—দাঁড়াও।

লোকটা উঠে কয়েক পা যেতেই ডাকলাম। ফিরে বললে—কি?

শুনে যাও।

কাছে আসতেই তার ডান হাতখানা টেনে সেই নোট কখানি আবার গুঁজে দিয়ে বললাম—ঘুষ না নিতে পারো কিন্তু আমিও কারো দয়া নিই নে। আর—হ্যাঁ—এই পাঁউরুটিখানাতেই আমার যথেষ্ট হবে, তার জন্যে কারো মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

কিন্তু তা হলে—

বললাম—জর আমার বড় বেড়েছে মিষ্টার, কথা কইতে আর ভাল লাগচে না।

লোকটা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলে গেল।

শূন্য মনে এক দিকে চেয়ে ছিলাম। এক আধটা সিন্ধু-পাখী মাঝে মাঝে এদিক থেকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছিল। জলের ভেতর থেকে 'ফ্লাইং ফিস্'ও মাঝে মাঝে এখান থেকে ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে।—বেলা গড়িয়ে গেছে।

কিন্তু—ওই না সেই আমাদের মাষ্টার! তাই ত বটে। আচ্ছা লোক ত! বুড়ো বয়সে অমন ড্যাব্‌ডেবে চোখে মেয়েদের দিকে তাকায় কেন? আর শুধু কি তাই? ছোট্ট একটি আয়না হাতে নিয়ে ফাঁকে ফাঁকে দিব্যি নিজের চেহারা দেখছে।—আয়নাটির আংটায় সুতো বেঁধে ওর আল্‌খেল্লায় ঝোলানো থাকে বটে!

হাতের ইসারায় ডাকলাম।

আসতে কি চায়! এক পা করে আসে আর একবার করে পেছনে তাকায়।

কি হচ্ছিল কি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?—বললাম।

ভারি অসহায় ভাবে এবার হাসলে। ডেকের বাইরে চেয়ে বললে—আমার স্বভাবটা এমনিই দাঁড়িয়ে গেছে ভাই। ওদের দেখলে আর থাকতেই পারি না।

নির্ব্বোধের মত বললাম—কি?

লোকটা ধরেও নিলে আমি নির্ব্বোধ। তেমনি কাছে এসে পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বললে—দেখ, এই তোমাদের মত যুবকরা যদি আমার ছাত্র হত! তা হলে দেখতে আমি কেমন করে—

তারপর অনর্গল বকে যেতে লাগল।

নিজের ঝুলি থেকে এক মুঠো বাদাম নিয়ে চিবোতে চিবোতে সে এমনি গল্প জুড়ে দিলে যে, কোনও তরুণ-তরুণী সেখানে থাকলে লজ্জায় তারা লাল হয়ে উঠ্‌তো; এবং শিক্ষিত ইংরেজ কেউ সেখানে উপস্থিত থাকলে তার ভাষা-জননীর ওপর এমন প্রচণ্ড বলাৎকার সে নিশ্চয়ই মুখ বুজে সহ্য করতো না।

চুপ করে রইলাম।

বাদাম খাওয়া শেষ হলে সে উঠে চলে গেল। তার একটা বিশেষ কথার অর্থ বোঝবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। পরে পকেট থেকে আমার সেই ছোট্ট কালো-মলাটের অভিধানখানি খুলে দেখতে বসে গেলাম।

এখানি বড় প্রিয় বন্ধু! অনেক বেফাঁস অবস্থা থেকে বাঁচায়।

হঠাৎ সুমুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলাম। দেখি অগাধ সমুদ্রের জল ঠিক পায়ের তলায় থৈ থৈ করছে। কাছে দূরে ঢেউয়ের প্রচণ্ড আক্ষেপ। ক্লান্ত চোখে চেয়ে রইলাম। বেলা আর নেই। সন্ধ্যার আগে জলের রঙ্‌টা ঠিক আর নীল থাকে না,—ছানার জলের মত মাধুর্য্যহীন আব্‌ছা সবুজ!

পূবে পাড়ি জমিয়েছে। ওদিকে ঘোলাটে অন্ধকার,—যেন কুয়াসার একটা হাল্‌কা পরদা। পশ্চিমে আজ আর সূর্য্যাস্তের বিশেষ সমারোহ নেই। জ্যোতিহীন সূর্য্যদেব জলের ওপর হেলে পড়েছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কতকগুলি মেয়ে অনেকক্ষণ থেকে কোলাহল করছে। অদূরে একটি বিলাতী যুবক চোখে একটি দূরবীণ লাগিয়ে পশ্চিম দিকে চেয়েছিল। কিন্তু ঠিক তা নয়—মেয়েদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ও তাদেরই দিকে চেয়ে আছে!

তা থাক্।

লোকটি যতক্ষণ কথা কয়—শুধু তার মুখের দিকেই চেয়ে থাকি। তার সেই অদ্ভুত চেহারা আর অপরূপ ভঙ্গীটির দিকে চাইলে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত সমস্ত সংসারটা নিরর্থক হয়ে যায়; ঔদাসীন্যে ফাঁকা হয়ে ওঠে।

আবার যখনই চোখের আড়ালে যায়, আরও অনেকখানি যেন তার দেখতে পাই। দৃষ্টি থেকে সরে গিয়ে সমস্ত মন যেন অজ্ঞাতেই অধিকার করে বসে।

ওই যে ওই আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমাকে লুকিয়ে ও মেয়েদের দেখতে চায়।

লোকটা দেখলাম নিজের অন্যায় এবং দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বেশ সচেতন।

জাহাজ দুলছে; হাওয়া উঠেছে। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সামুদ্রিক বাতাসের বোধ হয় কোথাও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

আকাশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে সন্ধ্যার শান্ত ছায়া নেমে আসছে।

এই মুহূর্ত্তগুলি সকলের মনেই ঘা দেয়। দুর্ব্বল লোকেরা শুনেছি এই সময়টায় উচ্ছ্বসিত কবিতা লিখে বসে।

জাহাজ দুলছে। আকাশের আলো মোছবার আগেই জাহাজের আলো জলেছে।

মেয়েগুলোর হুঁসই নেই যে ইস্কুল-মাষ্টার তাদের দিকে চেয়ে আছে। নিজেরাই এতক্ষণ হাসাহাসি করছিল। সামুদ্রিক সূর্য্যাস্তের নাকি একটা অপরূপ মাধুর্য্য আছে;—বোধ করি সেই দিকেই চেয়ে মেয়েগুলি একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ওরা রাজার জাত,—তাই প্রাকৃতিক শোভাকে এমন কায়দা করে সম্মান দিতে জানে।

আর নয় ত সচরাচর যা হয়ে থাকে,—ভাব-প্রবণতায় রুগ্ন!

দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করে মাষ্টার তখন এদিক ওদিক চাইছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে সরে এসে চোখে চোখে হেসে বললে—জ্বর একটু কম্‌লো? 'পিনের' ওপর তুমি যে এসে বসে আছ তা দেখতেই পাই নি।

বললাম—তাতে তোমার কাজের কোনো ক্ষতি হয় নি ত?

ম্লান হেসে বললে—কাজ! দেখছ না কত কাজের লোক আমি!—তা সবই বোধ হয় তুমি দেখেছ, কি আর তোমাকে লুকোবো!

কোনো গুরুতর ব্যাপার নাকি?

বললে চুপি চুপি—দেখলে? পাশের ওই সুন্দর মেয়েটি কেমন আমায় ইঙ্গিত করলে?

অতি কষ্টে হাসি চেপে বললাম—তাই নাকি? কি রকম ভাবে ইঙ্গিতটা করলে?

নরনারীর সম্পর্কে এই প্রশ্নটিই বোধ করি সব চেয়ে শক্ত। ইস্কুল-মাষ্টার আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—কেন? ইঙ্গিত বোঝবার বয়স কি আমার এখনও হয় নি? ভেবেছিলাম তুমি বুদ্ধিমান কিন্তু—

একটু চটে গিয়েছিল। বললাম—তা ধর, তোমাকে যদি তার ভালই লেগে থাকে!

মাষ্টার অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—ঠিক, এইবার ঠিক বলেছ তুমি। আরে ভাই, ভাল লাগাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা, এ কি অমনি যাবে?

বললাম—তোমার এই অপরূপ আলখেল্লাটাই হয়ত তার বেশি ভাল লেগেছে—না না, ঠাট্টা নয়—এতে তোমার গম্ভীর হবার কারণ নেই, তোমার এই পোষাকের যে একটা বিশেষ চমক আছে, যুবতী মেয়েদের এ সব ভারি ভাল লাগে। জানো?

তার মেঘাচ্ছন্ন মুখখানি আবার চক্ চক্ করে উঠলো। শুধু তাই নয়, সে করলে কি—যা বোধ হয় কোন দিন করে নি—নিজের মুখখানি পরিষ্কার করে মুছলে, গালে দুবার হাত বুলোলে, পরে আলখেল্লার ছেঁড়া অংশগুলি টেনে টেনে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করলে।

আলখেল্লাটা আজ যেন তার লজ্জা! তার গৌরবের উৎসবের দিনে এটা যেন কোনো দরিদ্র আত্মীয়ের কাঙাল-পনা।

বললে—আমি এমনিই চিরকাল। চিরকাল এমনি আলেয়ার পেছনে ঘুরি।—বলে সে একবার দূরের দিকে চাইলে। যেন নিজের সমস্ত অতীত আর সমস্ত ভবিষ্যতের প্রতি সে এক মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বুলোবার চেষ্টা করছে।

একটি গুজরাতি তরুণী এই দিকে পার হয়ে যাচ্ছিল। এমন কিছু ভাল দেখতে নয়, তবু মাষ্টার মুখ ফিরিয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার সমস্ত ভঙ্গীটির প্রতি চেয়ে রইল।

অবজ্ঞায় এবং বিরক্তিতে ঠোঁটের পাশে একটুখানি হাসি টেনে মেয়েটি চলে গেল।

গায়ে একটা টিপ্ দিয়ে হঠাৎ বললে—কেমন লাগলো?

বিশ্রী!—বললাম।

মাষ্টার তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো—আহা হা, কি বল তুমি? দেখতে যেমনই হোক, ও যে স্ত্রীলোক এটা ভুলে যাও কেন?

নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে বললে—ভালবাসার উদ্দেশ্য যার নেই,—তার কাছে জাতের বিচারও নেই, সুন্দর-কুৎসিতও নেই—বুঝলে?

মাষ্টার উঠে চলে গেল।—কিছুই বুঝি না হয় ত!

জ্বরের তাড়সে চোখ জ্বালা করে। চেয়ে চেয়ে তন্দ্রা এসেছিল।

কতক্ষণ জানি না,—কেমন ভাবে হঠাৎ চমকে জেগে উঠলাম। চেয়ে দেখি, মাথার ওপর ঘন অন্ধকার আকাশের সর্ব্বপ্রান্ত ঘিরে কালো মেঘে আচ্ছন্ন করেছে। আকাশের গুরু গম্ভীর গর্জ্জনের সঙ্গে সাগরের আকণ্ঠ হুহুঙ্কার মিশে এক হয়ে গেছে। জলে আর আকাশে কোন তফাৎ নেই,—চোখের সুমুখে চারিদিকে খানিকটা নিরাকার নিশ্চিহ্ন অন্ধকার!

নববর্ষার ঠিক পরিপূর্ণ রূপ! তার দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সমারোহও যেমন,—ব্যাকুলতাও তেমনি।

কাপ্তেন কখন্ যে 'সাইক্লোন' ঘোষণা করেছে জানতেই পারি নি। ডেকের ওপর যে ইতর যাত্রীরা ভিড় করে শুয়ে 'সামুদ্রিক পীড়ায়' ভুগছিল এর মধ্যে তারা কখন নীচে নেমে গেছে। এক আধটা লোক যারা অচেতন অবস্থায় তখনও শুয়ে আছে তাদের মুখ দিয়ে বমি গড়িয়ে পড়ছিল।

বৃষ্টি যখন সুরু হল তখনও সেই চিম্‌নির তলায় শুয়ে আছি। ঝড়ের দাপটে এর মধ্যে ডেকের তেরপল ছিঁড়ে গেছে। গায়ের ওপর দিয়ে ঝড়ও বইছে—বৃষ্টিও পড়ছে। জাহাজ 'রোল' করতে সুরু করেছে। মাস্তলটা একবার হেলে জলের কাছাকাছি ঝুঁকে পড়ছে—আবার উঠছে—আবার ডানদিকে জলের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। সেদিকে চাইলে ঠক্ ঠক্ করে গা কাঁপে।

উঠে নীচে নেমে যাবার সামর্থ্য নেই। রোলিং-এর মুখে উঠে দাঁড়ালে ছিট্‌কে জলে গিয়ে পড়বার সম্ভাবনা।

রাত কত ঠিক নাই। বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ করছে। জর বেড়েছে। চোখ বুজে আছি। মমতাহীন অন্ধ নিয়তি এই অন্ধকার অকূল পাথারের মধ্য দিয়ে কোথায় যেন টেনে নিয়ে চলেছে।

ঝড়—ঝড় আর বৃষ্টির সাপ্‌ট্। নিয়তির বিরুদ্ধে সমস্ত সৃষ্টি যেন ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ করেছে। নববর্ষার সৌন্দর্য্য লুপ্ত হয়ে গিয়ে আকাশ-পাতালব্যাপী এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা! সমস্ত জাহাজখানা নিঃশব্দে এই প্রলয়ের মধ্যে আত্ম সমর্পণ করেছে।

মাঝে মাঝে কাপ্তেনের তীক্ষ্ণ তীব্র এলারম্-এর বাঁশী শোনা যাচ্ছে। আবার চোখ খুললাম। বৃষ্টির জলের সঙ্গে চোখের জল কখন্ যে মিশেছে বুঝতেই পারি নি। সামান্য অশ্রুও আজ আর নিজের অধিকারে নেই। ফিরে যাও বললে সে আরও তেড়ে আসে।

হঠাৎ মনে হল, এই দারুণের মাঝখানে শুয়েও স্বপ্ন দেখছি। সেই কেরাণী সাহেবের ছায়া—ক্ষীণ আলোয় তার সেই একান্ত সস্নেহ দৃষ্টি! সেই নিরুদ্দেশ-পুত্র-শোকাতুর!

ছায়া যেন রূপায়িত হয়ে উঠলো। ছোট্ট জান্‌লাটির ফাঁকে মুখ রেখে শুধু বললে—আসবে আমার কেবিনে?

নির্লজ্জ! প্রাণপণে চীৎকার করে এবার তাকে শাসন করতে ইচ্ছে হল। স্বর ফুট্‌ল না। জড়িত কণ্ঠে বললাম—তুমি কে আমার?

আবার সে ছায়া মিলিয়ে গেল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম,—জনমানব কেউ নেই। একা শুয়ে আছি।

নজর-বন্দীই করেছিল বটে,—কথাটা তখন সে মিথ্যা বলে নি।

আধ-বোজা চোখে কোন্ দিকে যে চেয়ে আছি তা নিজেই জানি নে। মনে মনে শুধু অনুভব করছি,—আকাশ দুল্‌চে, সমুদ্র দুল্‌চে—শুয়ে আছি যেখানে সেটাও আজ ঝড়ের মুখে শেকড় হারিয়েছে।

দড়ি-দড়া নিয়ে খালাসি ছুটোছুটি কর্‌ছিল। আলোটা আড়ালে ছিল তাইপ্রথমে দেখতে পায় নি; এবার হঠাৎ নজর করে বললে—কে ইডা?

আর একজন বললে—আদ্‌মি মালুম হতিসে।

হটিয়ে দে না—দি গা হোই সিঁড়িতে নামায়ে—বেকুব!

কাছে এসে একজন মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বললে—নীচ্‌কে জাতি হোবে—হেই বাবু?

বললাম—আমি যে নজরবন্দী!

হুকুম নাই রইবার—যাও নীচে চলে,—শুন্‌তিসো?

শুন্‌ছি সবই। হোল্ডের দুরবস্থা জানি—নীচে যাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই।

কর্ত্তব্য শেষ করে খালাসিরা তাদের কাজে লেগে গেল।

কিন্তু বাইরের দুর্য্যোগ তখন ঘন হয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আকাশের গায়ে মাথা ঠুকে প্রচণ্ড গর্জ্জনে ভেঙ্গে পড়ছে। জাহাজের চারিদিকে তখন বৃষ্টির ভয়ানক চীৎকার!

ক্রমে ডেকের ওপর ঢেউ আছ্ড়ে পড়তে লাগলো। সে এক ভীষণ ব্যাপার। বড় বড় ঢেউ কোথা থেকে ছুটে আসে,—জাহাজও ঠিক সেই সময় হেলে পড়ে,—আর সেই ঢেউ লাফিয়ে ডেকের ওপর উঠে আছাড়ি-পিছাড়ি করতে থাকে।

গায়ের ওপর একটা ঢেউ এবার ভাঙ্‌লো! ব্যস্—জলে ডুব দিলাম; এই বার বোধ হয় জ্বরটা সারবে।

ছুটো খালাসি দেখি আবার আসছে। কাছে এসে আর কথা বলতে না দিয়ে জামার কলারটা ধরে টেনে তুল্‌লে। তখন টলছি। কাঁপছি।

বললাম—ছাড়ো ছাড়ো—আঃ।

ছাড়লে না। হুকুম তামিলের উৎসাহে হিঁচ্‌ড়ে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল। বললাম—মরি নি এখনও, মরিনি—ছাড়ো।

ছাড়্‌বে না আরো কিছু! তখন ব্যাকুলভাবে আমার সেই চারভাগের তিনভাগ-পাঁউরুটির দিকে ফিরে চাইলাম। কিন্তু হায় রে সঞ্চয়! দেখলাম প্রকাণ্ড একটা তরঙ্গ আমারই পরিবর্ত্তে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভাবলাম গিয়ে ধরে নিয়ে আসি। নোনা জলে লবণাক্ত হয়েছে,—খাওয়ার সুবিধে হবে! কিন্তু—ওঁক্!

ঘাড় ধরে খালাসি ছুটো ঠেলে দিলে সিঁড়ির মুখে!

গড়াতে গড়াতে কোথায় গিয়ে টলে পড়লাম বেশ মনে আছে। এক মাংস পিণ্ডের ওপর! জ্যান্ত মাংস। পরণে একখানা লুঙ্গী। মাথা তুলতেই দেখি এক কাব্‌লিওয়ালা।

সর্ব্বনাশ!—কিন্তু কথা কইবার আগেই লোকটা প্রচণ্ড জোরে একটি চড় কসিয়ে একটু হাসলে, তারপর ইঙ্গিতে সরে যেতে বললে।

সরে যাবো কোথায়! চড়ের চোটে চোখ যে অন্ধকার! তবু একটু নড়বার চেষ্টা করলাম।

আবার এক চাপড়।

এবার হাসলাম।—সে হাসি আয়না দিয়ে দেখা উচিত ছিল। পরে তার হাতের ওপর হাত বুলিয়ে খৃষ্টানী কায়দায় বললাম—অত জোরে চড় মার্‌লে, লাগেনি ত তোমার হাতে?

কাব্‌লিওলা কি বুঝলে জানিনে। ফিক্ ফিক্ করে হেসে আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে খেলা করতে লাগলো।

মন্দ লাগলো না। বড় বড় চুলে বহুকাল চিরুনী পড়ে নি।

কিন্তু—উঃ, আর একটু আস্তে টানলে ভাল হয় যে!

লোকটার হাত এড়াবার জন্যে আর একটু সরে গেলাম। কিন্তু অসাবধানে পা গিয়ে লাগলো যেন কার ঠিক মুখের ওপর। মাথা তুলতেই দেখি একটা উড়ে! কোলের কাছে তার পানের বগ্‌লি ছিল, লোকটা অক্ করে তার ওপর খানিকটা বমি করে ফেললে।

পরে অশ্লীল ভাষায় যে গালাগাল দিলে তা আর বলা চলে না।

পা সরিয়ে নিলাম। কিন্তু তা বললে কি হয়,—আর একখানা হুড়্‌কোর মত পা এসে গায়ের ওপর চেপে বসলো।

ফিরে দেখি—কাব্‌লিওলাই বটে!—আনন্দিত হলেম। ওদের চটাতে ভয় করে—নিতান্ত বেঘোরে পড়েছি।—ছুই হাত দিয়ে পদসেবা সুরু করে দিলাম।

'সময় বহিয়া যায়—কাহারও মুখ চাহে না হায়।'

উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের আক্ষেপ শুনতে পাচ্ছিলাম। রলিং-এর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মধ্যে সমস্ত ঘুমন্ত দেহগুলি পর্য্যন্ত টল্‌ছে।

কাব্‌লিওলা ঘুমিয়েছে। পদসেবা থামিয়ে পা-খানি নামিয়ে রাখতেই—ওমা, উক্!

মারলে আবার এক লাথি। লোকটা তাহলে জেগেই ছিল।

এবার সত্যি সত্যিই লেগেছে। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা যেন কুঁক্‌ড়ে গেল। এত বড় শারীরিক আঘাত বোধ হয় এই প্রথম। এর আগে সিঁড়ি দিয়ে পড়তে হাত-পা কেটে গিয়েছিল।

চুপ করে তার পায়ের ওপর হাত দিয়ে শুয়ে আছি। চোখে একবার জল এসেছিল কিন্তু জ্বরের উত্তাপে শুকিয়ে গেছে।

ঘন রাত্রি ঘনতর হয়!

তন্দ্রা আসে—আর তার চড় খেয়ে জেগে উঠি। মাঝে মাঝে টিপুনি দেয়। চুলের মুঠি ধরে নাড়ে; কখনও বা ঘুমন্ত চোখে আঙ্‌ল ঢুকিয়ে দেয়।

সমস্ত রাত্রি অক্লান্তভাবে একটা মানুষ আর একটা মানুষকে এমনি নিষ্ঠুর নির্য্যাতন করতে লাগলো।

আমি যেন তার খেয়ালের খেল্‌না!

সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছিল। দেহের কোনো অঙ্গে কোথাও বুঝি চেতনা নেই। জীবনের সঙ্গে সমস্ত বাঁধন সেদিন যেন এলিয়ে গিয়েছিল।

তন্দ্রা কি, কে জানে!

মুখের ওপর একটা জ্বালা অনুভব করলাম। জ্বালা যেন বাড়চে ক্রমশ। যেন দম আটকাচ্ছে।

হাঁপিয়ে উঠে চোখ চাইলাম। চেয়ে দেখি—দেখব আর কি ছাই—মনে হল, জীবনে এমন দুর্ভোগ অতি অল্পই ঘটেছে। ধারণা ছিল, সংসারে সব রকম অত্যাচারের হয়ত একটা সীমা আছে, কিন্তু মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার, তার কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা হয়ত সত্যিই নেই।

কাব্‌লিওলাটা মুখের ওপর মুখ দিয়ে পড়েছে, ঝাঁটার মত একরাশ দাঁড়ি-গোঁফে দম প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। কিন্তু এও তার যথেষ্ট নয়—দাঁত দিয়ে দুটো ঠোঁটের ওপর এমন কামড় বসিয়েছে যে ফেটে রক্তারক্তি।

মুখে হাত চেপে মাথা সরিয়ে নিলাম। হাতে রক্ত লাগল।

কিন্তু আবার সে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে এল—

এবং হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে জিব দিয়ে আমার মুখের সে রক্তটা চেটে নিলে।

সেদিন তার সেই উন্মাদ বিষ-চুম্বনের অর্থ আজও তেমনি রহস্যে আবৃত রয়ে গেছে।

এবং মানুষের প্রতি তার নির্দ্দয় অত্যাচারের গোড়ায় কোনো নিদারুণ ঘৃণা নিহিত ছিল কিনা, সে কথারও আজ আর উত্তর দেওয়া চলে না।

ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সে রাত্রি তেমনি করেই কেটে গেল!

বৃষ্টি নেই। ঝড় থেমে গেছে। জোরে জোরে বাতাস বইছে। ঢেউগুলো তেমন আর বেপরোয়া—বিদ্রোহী নয়। আকাশের মেঘ পাত্‌লা হয়ে গেছে।

গত রাত্রির মরণোন্মুখ যাত্রীরা এবার মাথা তুলে হাত-পা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে।

নবজীবনের সঙ্গে আজ যেন আবার ওদের নূতন পরিচয়!

খুপ্‌রি-জানলার দিকে চেয়ে দেখলাম, জল আর আকাশের বহুদূর প্রান্তে দিনের আলো ঝিক্‌মিক্ করছে। সজল আকাশ যেন গত রাত্রির অত্যাচারে ক্লান্ত-বিষণ্ণ হয়ে আছে।

আলো চোখে পড়তেই সমস্ত মন যেন সজাগ হয়ে উঠলো। যুগ-যুগান্তর হতে অন্ধকারে যেন নির্ব্বাসিত হয়েছিলাম!

হাতের ওপর ভর দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে উঠলাম। কাব্‌লিওলা ঘুমিয়ে পড়েছে। জানলার কাছে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে চাইলাম—আর কত দূর! স্থল কি আর দেখা যাবে না!

দু' একটা লোক এমন করে চাইলে—যেন পাগল হয়ে গেছি!

তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে আবার ডেকের ওপর উঠে এলাম।

আরে—বা, তুমি কোথা ছিলে কাল সারারাত? ভাল আছ বেশ?

ইস্কুল-মাষ্টার মাথা তুলে ঘাড় নাড়লে। পরে আমার মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে—তোমার এমন দশা হল কেন?

হাসবার চেষ্টা করে বললাম—দশ দশার এক দশা বোধ হয়।—

নারীদেহ-লোভী সেই ইস্কুল মাষ্টার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে তার সেই অদ্ভুত ইংরেজি ভাষায় বললে—তুমি কি আমায় একটুও ভাল চোখে দেখতে পার না?

বললাম—যদি না দেখতে পারি তাতে তোমার কিছু যায়-আসে না।

নিশ্বাস ফেলে সে বললে—ভেবেছিলাম তুমি অন্তত খানিকটা ভেবে দেখবে কিন্তু,—বলে সে একবার দূর আকাশের দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে—আচ্ছা, চিরকাল ধরে তোমরা একটা মানুষকে ঘৃণা করতে পারো? তার সম্বন্ধে কি কোনদিন—

চুপ করে রইলাম।

সে আবার বললে—আমি কিন্তু কাউকে ঘৃণা করতে পারি না ভাই! হয়ত আমি পাপী বলেই—কিম্বা, কিম্বা হয়ত আমি কিছু বুঝি না সেইজন্যেই। কিন্তু তুমি বল, আমি শুধু তোমারই কাছে শুনতে চাই।

লোকটা আজ উচ্ছ্বাসের উৎস খুলে দিয়েছে। কিন্তু ওকে সান্ত্বনা দেবার মত স্পর্দ্ধা কার!

সরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে মুখের কাছে মুখ এনে বললে—বলতে পরো আর কতকাল—কতকাল এমনি জানোয়ারের মত ক্ষুধার তাড়ায় ঘুরে বেড়াতে হবে? কিন্তু কি করবো, হাত নেই যে ভাই,—নিজের ওপর আমার কোনো হাত নেই যে! বলতে বলতে মাষ্টার নিতান্ত অসহায়ের মত বসে পড়ে তার সেই বাউল-বেশের দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগ্‌লো।

কথা উল্টে বললাম—বম্বেতে নেমে কোথায় যাবে?

কোথায়! তা ত' জানি না। সুন্দরী মেয়ে দেখলে হয়ত তারই পেছনে পেছনে যেতে হবে।

তাতে লাভ কি!

লাভ!—একটুখানি হেসে গভীর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাষ্টার বললে—লাভ হয়ত কিছু আছে। যদি সে একবার ফিরে চায়, যদি বা একটু হাসে! যদি বা—

আর যদি তিরস্কার করে?

তাও কম লাভ নয় ভাই! সুন্দরী মেয়ের লাঞ্ছনা পাওয়া যে মস্ত বড় সৌভাগ্য! আর সেই ত আমার জীবনের সঞ্চয়!

মাষ্টারের চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো।

তারপর দূরে তীর দেখা গেল। সবুজ গাছপালা, মাটী আর মানুষের জীবন-যাত্রার প্রতি নজর পড়লো! ওই মাটী আর সবুজ-শ্যামলতার জন্য সমস্ত অন্তরাত্মা ভেতরে ভেতরে যে কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

স্বপ্নরাজ্যের মত বোম্বাই শহর ধীরে ধীরে চোখের সুমুখে ভেসে উঠ্‌লো। গম্বুজ, মিনার, মন্দির-চূড়া, কলের চিম্‌নি, বড় বড় প্রাসাদ,—বাজীকরের খেলার মত একে একে এসে হাজির হল। চারিদিকে শুধু জীবনের চাঞ্চল্য, রঙের বাহুল্য, আত্মহারা মত্ততা, আর ঐশ্বর্য্যের যথেচ্ছাচার।

অনেক বেলায় জাহাজ জেটিতে এসে লাগলো। অভ্যর্থনা করবার জন্য অনেক যাত্রীর আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব জেটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের আনন্দ-কোলাহলের আর সীমা নেই।

একে একে সকল যাত্রীই নামলো। জাহাজ প্রায় ফাঁকা। পরিত্যক্ত শবদেহের মত সে পড়ে রইলো। দুর্য্যোগে দুর্গমে বন্ধুর মত সে মানুষকে পার করে, তাই আজ আনন্দের দিনে তার কোনও মূল্য নেই।

সকলের শেষে নেমে এলাম। একটি যুবতী মেয়ে এতক্ষণ ঘাটের ধারে প্রাণপণে কাকে খোঁজাখুঁজি করছিল। এই জাহাজে হয়ত তার কোনও পরিচিতের আসবার কথা ছিল।—আসে নি। ওই বয়সে অনেকেরই আসবার কথা থাকে—কিন্তু আসে না।

দরজা পার হবার সময় সেই কেরাণী সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা। টুপিটি নেড়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে। পরে বললে—আমার ছেলেটির দেখা যদি কোনদিন পাও তাহলে দয়া করে একটি খবর দেবে কি?

চেষ্টা করবো।—বলে চলে গেলাম। কোথায় যে যাচ্ছি তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। জন-সমারোহের মধ্যে অনেকখানি পথ চলে গিয়ে একবার ফিরে চাইলাম। দেখি সেই মেয়েটি আলুথালু হয়ে পথের ওপরেই বসে পড়েছে। কান্নার আবেগে সর্ব্বাঙ্গ তার নড়ছে।

আশ্চয্যি মেয়ে যা হোক! এই নববর্ষার নিশীথ রাত্রির মৃদু কম্পিত প্রদীপ-শিখার দিকে চেয়ে কাঁদলেই ত ভাল, এমন বারোয়ারীর মাঝে তীক্ষ্ণ রোদে পথের ধূলায় ··· কেন এ পাগলামী!

দূরে জাহাজের দিকে হঠাৎ একবার চোখ পড়তেই দেখি,—কেরাণী সায়েব তখনও চারিদিকের কোলাহলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে শুধু আমারই দিকে চেয়ে আছে। কিম্বা হয়ত তার সেই নিরুদ্দেশ-পুত্রেরই পথের দিকে!

আমিও একবার থমকে দাঁড়ালাম। মানব-স্রোতের দুই পারে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের মধ্যে কি যেন একটা নিবিড় পরিচয় হয়ে গেল!

মুশাফির

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

অনেক দিন পরে অশোক বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে বহুদিনের লুপ্ত—হাসি, আনন্দ, কলকণ্ঠ। জ্যোৎস্নার প্রাণের তারে কে যেন সহজ ও সতেজ একখানি সুর বাঁধিয়া দিয়াছে। অকারণে সে এখন হাসে, সব্রীড় কটাক্ষে তাকায়।

কিন্তু অকস্মাৎ আবার একদিন তাহার এ আনন্দ ফুরাইয়া গেল।

আঁচলে টান পড়িতেই জ্যোৎস্না দাঁড়াইল; রাত তখন দশটা। বলিল—লক্ষীটি এখন ছাড়ো, একটু বাদেই আসব 'খন্।

অশোক সে কথায় কান না দিয়া তাহার যত্নে বাঁধা খোপাটি ধরিয়া একটা টান দিল।

একহাতে অর্দ্ধচ্যুত খোপাটি কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া অন্য হাতে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ছাড়ো বল্‌ছি, না হলে দিদিকে ব'লে দেবো কিন্তু।—মধুর শাসন!

অশোক কেন জানি একটুও ভীত না হইয়া জবাব দিল—দিও ব'লে।

জ্যোৎস্না তৎপরতার সহিত এবার কাপড়খানি কাড়িয়া লইয়া বলিল—কাকেই বা বল্‌ব? সেও ত' তোমারি ...।

শেষের কথাটি শোনা গেল না।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল—কি বল্লে, কি?

জ্যোৎস্না কোন উত্তর না দিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। অশোক হয় ত' ভাবিল—

এ হাসির স্নিগ্ধতায় বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শ্যাম শস্পাঞ্চল কাঁপিয়া ওঠে; হয় ত' উদাস মুশাফির তাহার পথের

কথা ভুলিয়া নগ্ন আকাশের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে ; হয় ত ···

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আবার যখন জ্যোৎস্না ফিরিয়া আসিল, দেখে অশোক শুইয়া কি যেন ভাবিতেছে ; জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাবছ ?

অশোক বলিল—মস্ত বড় একটা কথা।

জ্যোৎস্না আয়ত নয়ন ঈষৎ লীলায়িত করিয়া বলিল—কত বড় ? ওই তালগাছটার মত ?—তারপর হাসিল। অশোক সে কথায় কান না দিয়া বলিল—ধরো তোমার যদি এবার ছেলে হয় তা হ'লে তাকে উৎসর্গ কর্‌তে পার্‌বে ?

বিস্মিতা ও লজ্জিতা জ্যোৎস্না নির্ব্বাক রহিল।

অশোক আবার প্রশ্ন করিল।

এবার জোৎস্না ধীরে ধীরে উত্তর করিল—উৎসর্গ কিসের জন্য ?

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব হইল—দেশের জন্য।

এ যেন তাহার প্রাণের কথা।

জ্যোৎস্না অবাক্ হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কথা কাহাকেও কোন দিন বলিতে শোনে নাই ; এই প্রথম।

কিছু পরে অশোক নিজেই বলিয়া যাইতে লাগিল—তোমার ছেলে হবে শিবাজীর মত, হবে ফ্রান্সের ··· —আর বলা হইল না, নীচে কাহাদের যেন ফিস্‌ফাস্ কথার আওয়াজ শোনা গেল।

অশোক তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা খুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কি দেখিল। তার পর যাহা ঘটিল তাহা জ্যোৎস্নার নিকট অচিন্তনীয়। তবে অশোক ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই যেন প্রস্তুত ছিল। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে ব্যাগ ও পিস্তলটা লইয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নার কমণায় উজ্জ্বল মুখ-কান্তির দিকে ক্ষণকাল মৌনভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—হয় ত' এ জীবনে এই শেষ সাক্ষাৎ জ্যোৎস্না !—তার পর তাহার সিঁথিতে একটি চুম্বন করিয়া জানালার কাছে আসিয়া একবার মুখ ফিরাইল।

স্বামীর এ অস্বাভাবিক ব্যবহারে জ্যোৎস্না বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, যেন মর্ম্মর মূর্ত্তি !

অশোক লোহার শিক ধরিয়া টান দেওয়া মাত্র জানালার চৌকাঠখানা খুলিয়া গেল। এ-ব্যবস্থা সে পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর লঘুপদে দোতলা হইতে অবতরণ করিয়া দিগন্তব্যাপী অন্ধকারে ডুব দিল।

সে অদৃশ্য হওয়া মাত্র জ্যোৎস্না একবার পাগলের মত জানালার কাছে ছুটিয়া আসিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া কাহাকে যেন খুঁজিল। অবশেষে সে বিছানায় ফিরিয়া এইটুকুই ভাবিতে পারিল যে, ইহা স্বপ্ন !

উঁচু নীচু কাঁকরময় প্রান্তর ; দূর হইতে মনে হয় কোন্ সন্ন্যাসীর গেরুয়া কাপড়খানি যেন রৌদ্রে শুকাইতেছে। একটি রাঙা সরু পথ তাহার বুকের মধ্য দিয়া যাইয়া আকাশের নীল শাড়ীখানার মধ্যে মুখ লুকাইয়া হাঁপাইতেছে ; সেও যেন মাতৃস্তন্যের জন্য কাঙাল।

মাঠের পশ্চিম সীমায় একটি ক্ষুদ্র গ্রাম তাপস রমণীর মতই রুদ্রের পূজা করিতেছে। তাহার অন্তরেও যেন অনন্ত বুভুক্ষা !

সেই গ্রামটাকেই লক্ষ্য করিয়া একজন লোক হাঁটিয়া চলিয়াছে। তাহার মাথায় একটা মাথাল ; মুখে ও পায়ে ধূলার আস্তরণ। তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু গ্রামে না পৌঁছিলে জল পাইবে কোথায় ? সূর্য্যের প্রখর দ্যুতি দিগ্‌দিগন্তে অভ্রের টুক্‌রার মত কাঁপিতেছিল।

অশোক পথের পাশে বসিয়া, পিঠের বোচ্‌কাটাকে নামাইয়া রাখিয়া গ্রামের দিকে তাকাইল। এখনও কম করিয়া তিন মাইল বাকি। পিপাসায় আর বসা হইল না। আবার চলা সুরু করিতে হইল।

গ্রামে প্রবেশ করিতেই নজর পড়িল একটি মেয়ের প্রতি, কানে তাহার রক্তজবা। সে বৃক্ষচ্ছায়ার অন্তরালে বিদ্যুতের মত খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

অশোক তাহার কাছে আসিয়া বলিল—বড় পিপাসা, এক ঘটি জল দাও।

ভীলের মেয়ে বাঙ্‌লা বোঝে, জল আনিতে ছুটিল। কানে গোজা জবা দুইটিও তাহার সহিত ছুটিয়া চলিল।

কেবল সে জল লইয়াই আসিল না, সঙ্গে আনিল একখানা হাতে বোনা পাখা, মাদুর, বট পাতার তৈয়ারী ঠোঙ্গা একটা।

জল ঢালিয়া দিয়া বলিল—বাবুজি খাও।—অশোক দেখিল জ্যোৎস্নার মেদুর স্নেহভরা চোখ দুইটি কবে যেন এই শ্যাম্‌লা মেয়েটি চুরি করিয়া আনিয়াছে। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঢগ্‌ ঢগ্‌ করিয়া জল খাইয়া ফেলিল।

অশোক একটু শান্ত হইলে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আস্‌ছ বাবুজি?

অশোক মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—মাথায় মাথাল, পায়ে ধুলো থাকিলেও বাবুজিত্ব ঘোচে না, বিপদ বটে!—মুখে বলিল—সহর থেকে।

অজানা পথের যাত্রীর মত পথে পথে ঘুরিয়াছে দুই মাস;—কত পল্লীবধূকে সায়াহ্নক্ষণে মা বলিয়া ডাকিয়াছে। কত কৃষকের সতেজ স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহের দিকে তাকাইয়া বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছে। তাহার অন্তহীন যাত্রার পথে কোন দিন বাধা পড়ে নাই। পথ তাহাকে ডাকিয়াছে, সে সাড়া দিয়াছে। কিন্তু আজ ক্ষুদ্র একটি পল্লী তাহাকে পথের প্রণয় হইতে ছিন্ন করিয়া লইল; যেন বলিল—শ্রান্ত পথিক, এই ত' তোমার ডেরা; এখানে একটু বিশ্রাম করো।

সে সেইখানে কিছুদিনের জন্য রহিবে বলিয়া তাহার পিঠের বোঝা নামাইয়া রাখিল।

অল্পদিনের মধ্যেই সকলের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। সকলেই তাহার সদ্ব্যবহারে অনুরক্ত হইয়া পড়িল; বৃদ্ধ, যুবতী, গ্রামের পাখীগুলি পর্য্যন্ত যেন। কিন্তু বাধ্য হইল না শুধু একজন, সে ময়না।

দিন যায়,—কর্ম্মহীন জীবন,—শুধু বসিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া অশোক ভাবে—জ্যোৎস্না!

উজ্জ্বল জ্যোৎস্না, ম্লান হইয়া গিয়াছে। হউক না সে পৃথিবীতে সব চাইতে আপন, তাহার এতটুকু সংবাদ রাখিতে পারে না এমন দুর্ভাগা সে।—আরো অনেক কিছু।

সেই দিন অশোক ঠিক করিল যে এ ভাবে চিন্তা করিয়া লাভ নাই। সে কোন একটা কাজ লইয়া প্রত্যহ ব্যস্ত থাকিবে। ভবিষ্যত যাহার অন্ধকার, তাহার বিষয় ভাবিয়া লাভ কি? ভাবিলে অন্ধকার শুধু নিবিড়তম হয় মাত্র।

পরদিন প্রভাতে সে একটা কোদাল লইয়া দশ জনের ভাগের জমির উপর জোরে একটা কোপ বসাইয়া দিল। কথাটা সকলে জানিতে পারিয়া বিরক্ত হইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—এ কাজ ক'রো না বাবুজি, ও জমি নিয়ে ঝগড়া হোচ্ছে।

অশোক যখন হাসি মুখে এ কাজের উপকারিতা সকলকে বুঝাইয়া দিল তখন সকলে ছুটোছুটি করিয়া যে, যে-কয়খানা পারিল কোদাল লইয়া উপস্থিত হইল।

অশোকই প্রথম তাহার কোদাল মাথার উপর তুলিয়া ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাহা করিল। সে উচ্চ কণ্ঠে বলিল—কালী মাইজিকি জয়—পর মুহূর্ত্তে একই কথা শত মুখে উচ্চারিত হইল ও কোদালগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া মাটির উপর পড়িল।

সন্ধ্যার সময় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল—কার জন্য ডিঘি খুঁড়ছ বাবুজি?

—তোমার জন্য ময়না!

ভাল করিয়া শুনিতে না পাইয়া একটু ঠাট্টা করিয়া বলিল—কার জন্য, তোমার বহুর জন্য?

অশোক হাসিল; মেয়েটি তাহার হাসির বঙ্কিমতায় নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় পালাইল।

সে গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ হইল কিছুদিন পরেই, কিন্তু অশোক আবার বেকার হইয়া পড়িল, আবার সেই চিন্তা—জ্যোৎস্না এখন কেমন আছে? সারাটা দিন ভরিয়া কি করে?—আরো একটি কথা তাহার মনে পড়িল—হয় ত' একটি অনাগত পথিক তাহার বুকের কাছে এত দিনের স্বপ্ন লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। না জানি কত সুন্দর সে!—জননী হইবার রূপলাবণ্য সে তাহার মুখে দেখিয়া আসিয়া-

ছিল। ভগ্নীও ইঙ্গিতে তাহা ভাইকে জানাইতে ছাড়ে নাই। যে সারাটা জীবন ভরিয়া মুশাফিরের মত ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহার আবার সংসার পাতিবার কি প্রয়োজন ছিল? মানুষের ভাগ্য এত নিষ্ঠুর কেন? কেন তাহার ভ্রান্তি এত সাঙ্ঘাতিক? তাহার জন্যই ত' আজ একটি নিরীহ বালিকা এত বড় পৃথিবীতে নিঃস্ব, দরিদ্র! তাহার জীবনের দীপশিখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু ঢেউয়ে একদিন নির্ব্বাপিত হইবে। হয় ত' সে সেই জানালাটির কাছে আসিয়া সময় সময় দাঁড়ায়, একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবে—ঐ পথে,—ঐ দিক দিয়া আসিত;—ঐ দিক দিয়া যাইত,'—আবার ঐ দিক দিয়াই নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আর আসিবে না কি?—পথ ঘাট সমস্তই চোখের কাছে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে; বিধাতার সৃষ্টি মুছিয়া যায়, শুধু যায় না নিজের গড়া সৃষ্টি! নিষ্ঠুর স্মৃতি!

পিছন হইতে মধুর কণ্ঠে ডাকিল—বাবুজি, ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছ?

অশোক মুখ ফিরাইল।

ময়না চট্‌ করিয়া বলিল—তোমার চোখে জল কেন?

অশোক ত্রস্তে চোখ মুছিয়া বলিল—কৈ জল পাগ্‌লী?

তখন সান্ধ্য সূর্য্যের সোনালি আলো তালগাছগুলির ফাঁক দিয়া আসিয়া কালো জলের উপর পড়িয়া ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। আকাশের এক কোণে একফালি চাঁদ ও একটি তারা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। অতল সুনীল জলে সন্ধ্যাবধূ দীপ ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই একটি শুধু চোখের সীমানায় এখন পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিয়াছে। আরো আসিবে শত, সহস্র।

ময়না আবার বলিল—তোমার ত' সাথী নেই, সাথী নেবে?

অশোক হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ নেবো।

ভিলবালা তাহার কোমল হাতখানা অশোকের দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। অশোক হাতখানা ধরিবার পূর্ব্বেই সে ছুটিয়া পালাইল। সস্নেহ নয়নে অশোক তাহার গতি ভঙ্গির দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃক্ষান্তরাল হইতে বালিকা একটি কিশোরকে টানিতে টানিতে অশোকের সম্মুখে উপস্থিত করিল। বলিল—বাবুজি, এই নেও সাথী।

অশোক দেখিল ময়নার মত এও আশ্চর্য্য! হাতে বাঁশী, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে অদ্ভুত প্রতিভার আলো। সে আবার নূতন একটা কাজ পাইল বলিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিল। ঠিক করিল—ইহাকে সে প্রত্যহ শিক্ষা দিবে, এই তাহার বিপদে বন্ধু, দুঃখে সাথী।

তারপর বলিল—আমার পাশে এসে ব'সো।—

উভয়ে পাশাপাশি বসিল। ময়নাও তাহাদের পায়ের কাছে যাইয়া বসিল।

রাজা অশোক, সন্ন্যাসী হইয়াই বুঝি নিরালা পল্লীর গোপন অন্তরালে আজ একটি বন্ধু খুঁজিয়া পাইল।

চার বৎসর ধরিয়া অশোক ভিল-বালককে লেখাপড়া শিখাইল। বালকের মুখে যাহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়। অদ্ভুত তাহার ধীশক্তি!

বালকের নাম উল্কা। নামটি অশোকের লাগিয়াছিলও খুব ভাল, কারণ সে তাহার কাছে উল্কার মতই আসিয়া ছিল। সে এক বাড়ীতে খাইত ও গরু চরাইত। এখন সে অশোকের কাছেই থাকে ও পড়ে। অশোক আসিবার সময় যে টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদের দুই জনার এখন বেশ চলিয়া যাইত। মাঝে মাঝে ডালা কুলা বুনিয়া তাহারা যাহা রোজগার করিত তাহাও কম না।

আরো দুই বৎসর অতীত হইলে উল্কা এমন শিক্ষিত হইয়া উঠিল যে সে নিজেদের ভাষায় সন্ধ্যার পর গ্রামের সমাজে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল। বুঝাইয়া দিত,—নিজেদের দরকার কি, কোথাকার টাকা কোথায় যাইয়া পড়িতেছে, পাটে, না ধানের চাষে লাভ বেশী ইত্যাদি, ইত্যাদি ... উল্কার মতই তাহার কথার তেজ, দুরন্ত গতি!

একদিন হঠাৎ অশোকের অসুখ হইল। কলেরার মতই।—

ভীলকন্যা এখন আর বালিকা নয়। আষাঢ়ের শ্যামঘনচ্ছায়া তাহার দুই নয়ন-পল্লবে। অস্তোন্মুখ শেষ রজনীর ক্ষীণ চন্দ্রের বঙ্কিম আবেশ তাহার ভ্রূযুগলে। কালো

মেয়ের শুভ্র, পবিত্র হাসি দেখিলে মনে হয় যেন নিভৃত পাহাড়ের বুকে বনানীর অন্তরালে কোন্ ঝর্ণার নিদ্রা ভাঙ্গিল।

সে ধীরে ধীরে স্নেহময়ী জননীর মত জিজ্ঞাসা করিল—বাবুজি, জল খাবে?—সেই ডাক্!

উত্তর দিবার অবসর হইল না, ইতিমধ্যে উল্কা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া কি যেন অশোকের কানে কানে বলিল। সংবাদ শুনিয়া অশোকের রগ্ন মুখখানি আরো মলিন হইয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি যেন ভাবিল, তারপর হঠাৎ উল্কার হাতখানা বুকের কাছে আনিয়া ডাকিল—উল্কা!

সে স্বরে উল্কা চমকিত হইয়া জবাব দিল—কি বাবুজি?

অশোক ধীরে ধীরে হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল—না, কিছুই না।

সেই-দিন গভীর রাত্রে অশোকের তন্দ্রা ভঙ্গিতেই শুনিতে পাইল, ময়না ও উল্কা ঝগড়া করিতেছে। উল্কা বলিল—আমি রাত জেগে থাক্‌ব, তুই মেয়েমানুষ, তোর শরীরে সইবে না তুই শো'গে।

ময়না হাসিয়া বলিল—বাবুজি কি ব'লেছিল জানিস্? অসুখ হ'লে সেবা ক'র্‌তে হয় মেয়েলোকের।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি তোর আর বাহাদুরী ক'র্‌তে হবে না।

ময়নাকে কেহ 'বাহাদুরী করিতেছে' বলিলে ভীষণ চটিয়া যাইত। সে বলিল—তা হ'লে আমি কিছুতেই শুতে যাব না।

উল্কা বলিল—নাই বা গেলি, তাতে আমার বড় ব'য়ে গেছে।—তারপর দুইজনেই মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুকাল পরে অশোক আবার শুনিতে পাইল যে উল্কা বলিতেছে—তোর পায় পড়ি ময়না! শুতে যা, তোর্ সঙ্গে আর ঝগড়া ক'র্‌ব না।

এবার ময়না উঠিল, বলিল—রাত্রে দরকার হ'লে আমাকে ডাকিস্।—তারপর নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল, একটু হাসিলও।

অশোকের এ স্নেহশিকরসিক্ত অভিমান বড় ভাল-লাগিল। কিন্তু দুঃখ হইল যে, ইহাদেরও ছাড়িয়া যাইতে হইবে; ইহাদের সহিতও তাহার দেনা-পাওনা শেষ হইতে চলিয়াছে।

কয়েক দিন পরের কথা। উল্কা ঠিক্ সংবাদই আনিয়াছিল, যেমন সত্য তেমনই নিদারুণ। তাহার জন্যই অশোক রাত্রে শুইয়া ভাবিতেছিল—এখন আর দেরী করা উচিত নয়। পুলিশে যখন সংবাদ পাইয়াছে তখন সময় থাকিতেই সরিয়া পড়া ভাল। উল্কা আর কতদিন তাহাদের উপর নজর রাখিতে পারিবে? তাহারা যে শ্যেনপক্ষী অপেক্ষাও ধূর্ত্ত!

আজ দুইদিন হয় তাহার শরীরও একটু ভাল বোধ হইতেছে। ময়না ও উল্কা যাহাদের বেশী ভয় তাহারা এখন একটু ঘুমাইতেছে। গ্রামের কেহই কিছু জানিতে পারিবে না। এই ত' সুযোগ। রাত্রি এখনও অনেক আছে। বাহির গ্রামের পথে পড়িবার আগে ভোরও হইবে না! আজ যদি সে না যায় তাহা হইলে এ-সুযোগ তাহার আর ঘটিয়া ওঠা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ উল্কা প্রায় রাত্রেই ঘুমায় না, পাহারা দিয়াই কাটায়। সে যদি জানিতে পারে তাহা হইলে তাহার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়িবে না। তাহার মত গৃহহীনের জন্য আর একজন কেন গৃহহারা হইবে? শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকেও চির-দুঃখিনী করা হইবে যে।

অশোকের সেইদিন রাত্রের ঘটনাগুলি মনে পড়িল। অভিমানিনী ময়না কত দুষ্ট ও মধুর! সঙ্গে সঙ্গে আরো মনে পড়িল কালীপূজার দিন ময়না কি করিয়াছিল।

যতক্ষণ না উল্কা বাহির গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিল ততক্ষণ সে কিছুতেই প্রসাদ খাইল না। সে আসিলে পরে তাহাকে সুন্দর করিয়া একটি সিন্দুরের ফোঁটা কাটিয়া দিল। আশীর্ব্বাদের ফুল-বেলপাতা তাহার হাতে দিল, তারপর দুই জনে প্রসাদ গ্রহণ করিল। এমন মধুর আত্মীয়তা সে হৃদয়-হীনের মত কেন নষ্ট করিতে যাইবে! যে প্রণয়-প্রবাহ

ধারা দুইটি বহুদূর হইতে বহিয়া আসিয়া একত্র মিশিতে যাইতেছে তাহাকে কি মানুষের কর্ত্তব্য ভিন্ন করিয়া দেওয়া?

এইরূপ আরো কত কি অশোক ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারপর নিঃশব্দে উল্কার কাছে আসিয়া তাহার শিয়রে একখানা হাত রাখিয়া মনে মনে বলিল—উল্কা, দুঃখ করিস না, তোর হতভাগ্য বন্ধু আজ আবার পথে বাহির হইল ভাই। উদাসীন বিবাগীর জন্ম স্নেহ মায়া মমতা ভগবান সৃষ্টি করেন নাই, তাহা তোদেরই জন্ম।

অশোক তাহার সেই পুরাতন ব্যাগটা উঠাইয়া লইয়া পিঠে একটা বোঁচ্‌কা বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িল। আবার যাত্রা।

বাঁশঝাড়ের ঠিক পিছনেই একটা উঁচু ঢিবি। সেই ঢিবিটার উপর আসিয়া অশোক মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া একবার এই বহু দিবসের কর্ম্ম ও কাহিনী বিজড়িত গ্রামের দিকে কাতর নয়নে তাকাইল; যেন সন্তান মায়ের কাছে নীরবে বিদায় চাহিতেছে।

এমন সময় সেই অপূর্ব্ব মৌনতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন ডাকিতেছে—বাবুজি!—

অশোক চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল ময়না ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার প্রাণে বড় বাজিল।

ময়না ছুটিয়া আসিয়া একেবারে অশোকের হাত দুইখানা একত্রে ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে কান্না আর থামে না; কত অপরাধের এ যেন তীব্র শাসন!

অশোক বলিল—কাঁদিস্ কেন পাগ্‌লী? ছি! থাম্।

তেমনি ভাবেই মুখখানি অশোকের করতলে রাখিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল—তুমি চলে যাচ্ছ কেন না ব'লে?'

অশোক বুঝিল, ও সমস্তই জানিতে পারিয়াছে। সে উত্তর না দিয়া অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অশোককে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ময়না তাহার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া হেঁকি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—বলো, বলো বাবুজি, কেন আমাদের না ব'লে চ'লে যাচ্ছো?

—তোরা জানলে যে আমার বেশী কষ্ট হবে তাই তোদের না ব'লেই যাচ্ছিলাম।

ময়না একটু শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বাবু, উল্কা যে বলে পুলিশে তোমায় দেখ্‌লে আর ছাড়্‌বে না, তা সত্যি নাকি?

অশোক এইবার খুব খানিকটা হাসিয়া উত্তর দিল—তবে ত' তুই সবি-ই জানিস্, তা হ'লে আর পাগ্‌লামী করিস্ কেন? এখন আমায় ছাড়্, ঐ ভোর হয় যে।—

এ হাসির গভীরতা হয় ত' ময়না উপলব্ধি করিতে পারিল না।

ময়না বলিল—তুমি কি আর আসবে না?

অশোক এবার আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। মুখ নীচু করিয়া শুধু বলিল—আমায় যেতে দে ময়না।

ময়না অনেকক্ষণ ধরিয়া কি যেন ভাবিল। তারপর অশোককে ছাড়িয়া দিয়া একটা বাঁশের কঞ্চি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিল,—যে গেরুয়া মাটির পথে একদিন অশোক আসিয়াছিল সেই পথেই ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উদাসীন অশোক দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি পথ ভাঙ্গিয়া চলিল। বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা সে জানে না; যেন সে পথের তৃষ্ণা লইয়াই জন্মিয়াছিল। বন্দর যখন ছাড়িল তখন আর কূলের কি প্রয়োজন?

উল্কা ও ময়নার স্মৃতি মুছিবার জন্ম সে প্রাণপণে চেষ্ট করিতে লাগিল। যাহাদের সহিত এ জীবনে আর দেখা হইবে না তাহাদের কথা ভাবিয়া লাভ কি?

একদিন সে সহসা থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চা'ই দোকানী, এ কোন্ জেলা?

দোকানী বিরক্ত হইয়াছিল; বলিল—বর্দ্ধমান।

হঠাৎ অশোকের প্রাণ নিজের দেশের নাম শুনিয়া চঞ্চল

হইয়া উঠিল,—সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—শিবপুর এখান থেকে কতদূর?

দোকানী বিরক্ত হইয়া বলিল—কি জানি বাপু, কোশ পঁচিশ হবে।

অশোকের প্রাণে আনন্দের বান্ ডাকিল।

কতদিন সে ক্ষুধার তাড়ায় ভিক্ষা করিয়াছে, গরু চরাইয়াছে, দিন-মজুরী করিয়াছে কিন্তু কোনদিন সে নিজেকে এত ক্লান্ত মনে করে নাই। আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন এতটুকু স্নেহস্পর্শ ও শুশ্রূষার জন্য ক্ষুধিত, লালায়িত!

অশোক সেদিন একটা সরাইয়ে আশ্রয় লইল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উৎসুক হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিল—জ্যোৎস্না যেন তাহার পুত্রটিকে লইয়া আসিয়া তাহার কাছে ছাড়িয়া দিয়াছে। জ্যোৎস্নার কপোলে আনন্দাশ্রু, বালকের চোখের পাতাও সিক্ত, যেন ফুলের চোখে শিশির!...

পিতা, পুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষ শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, মাতা অন্ধ হইয়াছেন।...

ভগ্নী বিষণ্ণ আলোক-রেখাটির মত বাতায়ন-পথে চাহিয়া আছে।...

শেষ রাত্রে অশোক তাহার যথাসর্ব্বস্ব সরাইয়ে ফেলিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। রাত্রি জাগরণে তাহার চক্ষু রক্ত বর্ণ, মুখ পাণ্ডুর মলিন। দেহ নিতান্তই বলহীন হইয়াছিল, তবু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া উন্মাদের মত পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

ক্রমে বেলা বাড়ীতে লাগিল, তবু শেষ নাই।

মাঠের পর শুধু মাঠ রৌদ্রকিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। একটি তৃণ নাই, একটি গরু পর্য্যন্ত চরে না, জনমানবহীন এ-প্রান্তর দেখিলে মনে হয় যেন রৌদ্রদগ্ধ শ্মশান।

পায়ে চলা অস্পষ্ট একটা রাস্তা দিয়া অশোক চলিতেছিল। প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল ইহা বোধ হয় তাহার দেশে যাইবার পথ নয়। যখন সে দেশ ছাড়িয়াছিল তখন ত' মাঠের মাঝে মাঝে বসতি ছিল, ধানি জমি ছিল, আজ তাহা গেল কোথায়? তবে সে দুই এক স্থানে পূর্ব্বে যে বসতি বাড়ীর উঁচু ভিটি ছিল তাহাও লক্ষ্য করিল এবং তাহার চতুর্দ্দিকের গাছগাছালির কিছু কিছু চিহ্নও দেখিল। সে মনে মনে বিস্মিত হইয়া নানা প্রকার আশঙ্কার কথা ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইল।

অবশেষে শ্রান্ত দেহে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সন্ধ্যার প্রাকালে একটি বসতি বিরল গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। একটু লক্ষ্য করিতেই চিনিতে পারিল ইহা তাহাদেরই দেশ। দেখিল, —একখানি ঘরও নাই, মাংসহীন কঙ্কালের মত হয়ত' দুই একটা জীর্ণ দালান পড়িয়া আছে; তাহাতে যে কোন দিন কেহ বাস করিত সে লক্ষণ নাই। বড় বড় দুই একটি গাছ বাঁচিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে বাজারখোলার বটগাছ একটি। ছোট ছোট গাছের পত্রহীন শাখাগুলি আকাশের দিকে আর্ত্ত চক্ষু মেলিয়া দিয়া কি যেন জানাইতেছে; তাহারা যেন তৃষ্ণার্ত্ত প্রেতাত্মা!

সে আরো কিছু দূর ভিতরে সন্দিগ্ধ মনে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল এখানে সেখানে পশু ও নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই সময় একটা মাংসভুক্ পাখী অদূরের নেড়া গাছটার উপর হইতে বিশ্রী একটা শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা ব্যাপ্ত করিয়া দিল। একটা শৃগাল সেই শব্দ যেন তন্ময় হইয়া শুনিল।

একটু পরেই সে তাহাদের বাড়ীর আমগাছটা দেখিতে পাইল। হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হইল, ভূগর্ভের গলিত ধাতুপ্রবাহের মতই হয় ত'। ভাবিল—এ পৃথিবীতে তাহার কি আর কেহই নাই? সবই শেষ হইয়াছে?

বিশ্বাস হইয়াও হইল না; সে কম্পিত পদে নিজের বাড়ীর দিকে ছুটিল। বাড়ীর আটচালা পার হইতেই পুরাতন ভৃত্য ষষ্ঠির সঙ্গে দেখা; তাহার হাতে প্রদীপ; হয় ত' তুলসী-তলায় যাইতেছিল।

অশোক নিষ্ঠুরভাবে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিল। বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিছুই শোনা গেল না।

কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ ভৃত্য প্রথমত চমকিত হইয়া হাত ছাড়াইয়া নিতে গেল, অবশেষে সে যখন অশোককে চিনিতে পারিল তখন হাতের প্রদীপ মাটিতে ফেলিয়া অশোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল—বৌ, বৌ কৈ যষ্ঠি? বাবা? ...

তাহার চক্ষু ফাটিয়া যেন রক্ত বাহির হইতে চাহিতেছিল।

বৃদ্ধ যষ্ঠির অবস্থা দেখিয়া অশোক কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে যতদুর পারিল সংযত করিয়া লইয়া বলিল—কাঁদিস্ না আর; সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছি, তবু তুই একবার বল্, তোর মুখে চিরদিনের জন্য সকলের কথা শুনে নি।

যষ্ঠি ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে যাহা বলিল তাহা গুছাইলে এই হয়—আষাঢ়ের অমাবস্যায় বানেশ্বরী হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিল, মানুষের হাতের বাঁধ দেবতার পায়ের ঠেলায় ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে প্রথম এক হাঁটু, তারপর এক বুক, অবশেষে ঠাঁই পাওয়ার উপায় রহিল না। ঘুম ভাঙ্গিতে কেহ গয়না কেহ পোঁতা টাকার জন্য কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ছুটোছুটি করিতে লাগিল। জল ত' কাহারও জন্য দেরী করে না, সমস্ত সৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে লাগিল। যাহারা ঘরে রহিল তাহারা দম বন্ধ হইয়া মরিল, যাহারা বাহির হইল তাহারা তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

যষ্ঠি ও জন কয়েক একটা বড় গাছের সহিত নিজেদের কাপড় বাঁধিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তারপর যখন তাহাদের জ্ঞান হইল তখন তাহারা হাসপাতালে। কিছুদিন পরে হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া যষ্ঠি গ্রামের দিকে ছুটিল। পথে কতগুলি মুচির সঙ্গে দেখা, তাহারা ঐ গ্রামে বাসা বাঁধিতে যাইতেছে। হাড় চালান দিবে। যষ্ঠি সঙ্গী পাইল।

গ্রামে আসিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে কর্ত্তার ভিটার মায়া ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিল না। মুচিরা এখন তাহারই প্রজা। এতদিন সে রোজ অশোকের আশা পথ চাহিয়া ভগবানকে ডাকিয়াছে।

অশোক যষ্ঠির সমস্ত কথা নিঃশব্দে শুনিয়া গেল। কোন প্রশ্ন করিল না। শুধু একটা মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ছাড়িয়া শূন্য দৃষ্টিতে কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

হয়ত' ভাবিল—যষ্ঠি মানুষ না দেবতা? এত মায়া, এত কৃতজ্ঞতাও ওই অস্থিসার দেহে থাকিতে পারে!

অথবা জাগিয়া জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিল—শ্রাবণের অন্ধকারে চতুর্দ্দিক বিলুপ্ত। ঘন ঘন বজ্রধ্বনি। হঠাৎ বঙ্গোপসাগর উন্মাদ হইয়া বঙ্গ দেশটাকে ডুবাইয়া দিল। জনপ্রাণীর এতটুকু নিশ্বাস লইবার জন্য সে কি প্রবল আকুতি! সে কি প্রাণপণ চেষ্টা! সমস্তই বৃথা। কলকল শব্দে জলরাশি স্ফীত হইয়া মনুষ্য ভাগ্য ও কীর্ত্তিকে বিদ্রূপ করিয়া অট্টহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বহিয়া চলিল। ... প্রভাত হইল; ক্রমশ জল নামিয়া গেল; সাগর শান্ত হইল। প্রকৃতির সে কি বিরাট গম্ভীর মূর্ত্তি!

দুই একটি লোক যাহারা কোন প্রকারে বাঁচিয়াছিল তাহারা ভিক্ষাপাত্র লইয়া বাহির হইল। কাহারও দেহ অর্দ্ধাবৃত, কেহ উলঙ্গ। তাহারা সকলে একত্রে বিরাট জগতের সম্মুখে ক্ষীণ শীর্ণ হস্তে ভিক্ষাপাত্রগুলি তুলিয়া ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল—ক্ষুধা! ক্ষুধা!

যষ্ঠি ডাকিল—দাদাবাবু!

অশোক একটা অস্বাভাবিক স্বরে জবাব দিল—অ্যাঁ—তারপর যষ্ঠিকে বলিল—যাবি ত' আয়, আমি চললাম।

যষ্ঠি ঠিক শুনিল কি না কে জানে?

অশোকের এ জীবনে কতবার পাথেয় ফুরাইল, কিন্তু পথ ফুরাইল না।

বিবর্ত্তন

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত রাত্রি মত্ত অবস্থায় বাহিরে কাটাইয়া অমিয় ভোরে বাড়ী ফিরিল। নেশার তীব্রতা তখনও সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে, কিন্তু জ্ঞানটা একেবারে যায় নাই।

পা টিপিয়া শয়নঘরে গেল, সিঁড়িতে এতটুকু পদশব্দ হইল না। দুইটি নিমীলিত আঁখির স্তিমিত দৃষ্টিতে এটিও অতি স্পষ্ট দেখিল যে স্ত্রী শয্যায় নাই। এখনই নাই, না সমস্ত রাত্রিই ছিল না, বিচার করিবার মত মস্তিষ্কের অবস্থা ছিল না। কোনমতে পায়ের জুতাটা খুলিয়া শয্যায় মাথা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

এমনি ধারা প্রায়ই চলিতে চলিতে বাড়ীর সকলেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইদানীং ধারাটা বদলাইতে হইয়াছিল। তাহার কারণ, পিতা মৃত্যুশয্যায়। ঠিক দুইটা ঘর পরেই তিনি শুইয়া আছেন।

পিতাকে এমনি অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সে বাহিরে মাত্‌লামী করিয়া রাত্রি কাটাইবে, এমন মতি তাহার মোটেই ছিল না। কিন্তু বন্ধুর দলে পড়িয়া কেমন করিয়া কি ঘটিয়া গেল।—

কেন ঘটিল, তাহার কারণ খুবই স্পষ্ট। রঙীন মদ এবং স্ত্রীলোক—তাহার উপর বহু দিনের অভ্যাস, বুদ্ধিটা একটু পাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই।

সেইজন্য বহু রাত্রের সঙ্গে আর এক রাত্রির যোগ হইয়া গেল। কিন্তু তফাৎ রহিল এই যে, পিতা মুমূর্ষু।

নেশায় চোখ বুঁজিয়া আসিয়া কখন তন্দ্রা আসিয়াছিল, একটা গোলমালে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল সম্মুখে স্ত্রী।

অমিয় সোজা উঠিয়া বসিল।

স্ত্রী অধৈর্য্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এখনও ব'সে রইলে? শীগ্‌গীর যাও,—সব শেষ হ'য়ে গেছে!

অমিয়র নেশা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। কিন্তু বজ্রপাতটা কিরূপে হইল, ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই চাহিয়া দেখিল, স্ত্রী কখন চলিয়া গিয়াছে।

অনুভূতির কেন্দ্রমণ্ডলে একটা চাকা যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

সেটা নেশায় নয়।

শেষ সময়ে পিতাকে দেখিতে পাইল না। দেখিল তাঁহার সব শেষের দেহটাকে। এমন করিয়া কোন দিন দেখে নাই।

মনে হইল, পিতার চোখ দুইটা বুঁজিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া যেন স্থির হইয়া গিয়াছে। এই নিষ্পলক দৃষ্টি চক্ষুর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অমিয়র মনে হইল, এ-দৃষ্টি তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

পাশের ঘরেই কান্নার রোল উঠিয়াছে, শব্দটা অমিয়র কানে গুঞ্জনের মত-শোনাইতে লাগিল।

ঘর হইতে একে একে সকলে সরিয়া গেল। রহিল, কেবল পিতা ও পুত্র। একজন মৃত ও একজন জীবিত।

পুত্রের জীবন-প্রবাহে পূর্ণ চেতনা ফিরিয়া আসিল। আস্তে আস্তে সে একটা হাত মৃতের পায়ের উপর রাখিল। মনে হইল, মৃতের নত নেত্রের অন্তরাল দিয়া একটি মৃদু হাস্য খেলিয়া গেল।

অমিয়র আপাদমস্তক বার বার কাঁপিয়া উঠিল।

মৃতের ঠোঁট দুইটা যেন নড়িয়া উঠিল। অমিয় চারি-

দিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ নাই। শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না। কে যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার মৃতের মুখের উপরই পড়িতে লাগিল। মনে হইল, এই মৃত লোকটি কোন সময়ে নিঃশব্দে হাসিয়া উঠিয়াছিল, সে হাসি এখনও মিলায় নাই। সহসা সে চোখ ফিরাইতে পারিল না। হাস্য কুঞ্চিত প্রাণহীন ওষ্ঠের দিকে চাহিয়াই রহিল। আর ভয় হইল না। বরং এক প্রকার কৌতূহল অনুভব করিতে লাগিল।

মৃতের দেহে একটি স্থান অনাবৃত হইয়া পড়িয়া ছিল। অমিয় অকম্পিত হস্তে সেখানে ঢাকা দিয়া দিল। মাথার চুল দুই হাতে পরিষ্কার করিয়া দিল। একটা হাত কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

পিতা যেন সবেমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। পুত্র তাঁহার সেবা করিতেছে।

অমিয় আবার মুখের দিকে চাহিল। মনে হইল তিনি যেন কি বলিতে চাহেন। অমিয় তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিল, বাবা!

নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মৃতের হাতটা কোল হইতে নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমনি সময়ে দ্বারে কোলাহল শোনা গেল। ঘরের এবং বাহিরের বহু লোক আসিয়াছে। বাহিরে খাট আসিয়াছে। বেশী বেলা করা মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়—

দুই ঘণ্টা মৃতের ঘরে থাকয়া অমিয় বাহির হইয়া আসিল।—

২

কথাটা প্রকাশ হইতে একটুও বিলম্ব হইল না যে, স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি প্রাণগোপালবাবু পুত্রবধূর নামে লিখিয়া দিয়াছেন। পুত্রকে একটি কপর্দ্দকও দিয়া যান নাই।

যথাকালে অমিয়ও শুনিল।

কাজকর্ম্ম হইয়া গেলে পিসী আসিয়া বলিলেন, তলায় তলায় ষড়যন্ত্র ছিল, নইলে কি আর এমন হয়? তাই বলি ছেলে হয়ে গেল পর, আর কোথাকার কোন্ আবাগীর বেটী,—সে-ই হয়ে গেল কিনা এত আপনার! একটু থামিয়া আসল কথাটা পাড়িলেন, বলিলেন, এত বোঝালুম, মুখ ভোঁতা হয়ে গেল, একটি টু শব্দ করলে না! কত বললুম, দে, বিষয় যার প্রাপ্য তার নামে লিখে দে—হ্যাঁ কি না একটা কথাও বললে না গা! বলিয়া তিনি অমিয়র মুখের দিকে চাহিলেন। সেখানে একটা কঠোর গাম্ভীর্য্য ছাড়া আর কোন বৈলক্ষণ্যই খুঁজিয়া পাইলেন না, এবং ইহাকেই তিনি অতি অনুকূল ভাব বলিয়া গ্রহণ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতে লাগিলেন, আবার শুনেছো, বৌ'র বাবা আসছে, নিয়ে যাবে বলে। বলে দিচ্ছি আমি, তুই দেখে নিস্ তলায় তলায় ওই বুড়োর হাত আছে কি না!

ইহার পরই পিসীর স্বর্গগত ভ্রাতার জন্য সহসা শোক উথলিয়া উঠিল, বাক্য ও অশ্রু দুই একসঙ্গে বর্ষিত হইতে লাগিল।

অমিয় একভাবেই বসিয়া রহিল।

পিতার মৃত্যুর পর কবে হইতে অমিয়র অন্তর্জীবনে ভাঙ্গন সুরু হইয়াছিল, সেখানে কি ভাঙ্গিয়া কি গড়িয়া উঠিতেছিল, এতদিন কেহ বুঝিতে পারে নাই। তাহার লক্ষণ আস্তে আস্তে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রাণগোপাল বাবু যে ঘরটায় মারা গিয়াছেন, সে ঘরে কেহ বড় একটা প্রবেশ করিত না। রাত্রে একমাত্র অমিয়ই সে ঘরে যাইত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই নিরালা গৃহে অতিবাহিত করিয়া গভীর রাত্রে শয়ন করিতে যাইত। কোন রাত্রি এবে বারেই বাহির হইত না।

ক্রমে তাহার রাত্রি-বাস স্থান এইখানেই হইল।

এমনি করিয়া রাত্রের পর রাত্রি কাটিতে লাগিল। কোনদিন স্ত্রী ঘুম ভাঙ্গিয়া ডাকিতে আসিলে দেখিত, অমিয় টেবিলের উপর রাশিকৃত পুস্তক লইয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আছে। আর ডাকিত না, ফিরিয়া যাইত।

প্রাণগোপাল বাবু মরিবার আগের দিনটি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, তাঁহার শয়ন, আহার সব ঐ একটি ঘরেই ছিল। এবং সে ঘরটিতে চারিদিকে রাশি রাশি পুস্তক ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না। স্ত্রী মারা যাইবার পর সংসারে আর একটি জিনিষ তিনি ভালবাসিয়াছিলেন,—তাহা অধ্যয়ন।

লোকে বলিল, অমিয় পিতার ধাত পাইয়াছে। হাজার হইলেও পিতারই সন্তান,—ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন!

কিন্তু ক্রমের মাত্রা দেখিয়া সকলের মুখ শুথাইয়া গেল। দিন নাই, রাত নাই, কাজ নাই,—কিছুই নাই,—কেবল পড়া।

পিসী ভাবিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। একদিন অতি সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশ করিয়া, কোথায় দিন কয়েকের জন্য বেড়াইয়া আসিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না।

অমিয় বলিল, বৌ'কে একবার ডেকে দিতে পারো পিসীমা?

পিসী বলিলেন, সে ত নেই বাবা! আজ সাতদিন হ'ল বাপের বাড়ী গেছে। তা' যদি বল ত' কালই আসতে লিখে দি!

অমিয় ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, তার দরকার নেই। তুমি লিখে দাও বিলেতে কতগুলো বইয়ের জন্যে লিখেছিলুম সেগুলো এসে পৌছেচে। তার জন্যে পাঁচ শ' টাকার দরকার—সেইটে যেন পাঠিয়ে দেয়।

পিসী আর কিছু বলিলেন না। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

দিন তিনেক পরে সুরমা হঠাৎ বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল।

অমিয় বই হইতে মুখ তুলিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ না করিয়া বলিল, আমাকে পাঁচ শ' টাকা দাও ত'! বইগুলো অনেকদিন পড়ে আছে—

সুরমা কোন উত্তর করিল না। কাপড়ের তলা হইতে একত্র বাঁধা কতকগুলো কাগজ বাহির করিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া দিল।

অমিয় অবাক হইয়া একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, পরে কাগজের বাণ্ডিলটা খুলিয়া সমস্ত পড়িল। পড়িয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, এর কি দরকার ছিল? একজনের নামে সম্পত্তি থাকলেই হল, তা সে' আমার নামেই হ'ক, বা তোমার নামেই হ'ক! যাক্ গে,—সরকার মশাইকে বলে কালকে আমায় পাঁচ শ' টাকার জোগাড় ক'রে দিও।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, সুরমা তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া অমিয় মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, এ কি কাঁদছো কেন?

সুরমা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। চোখ মুছিয়া বলিল, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমনি করে শাস্তি দিচ্ছো?

অমিয়র বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বিস্ময় কাটাইয়া যখন কথা বলিতে গেল, সুরমা তখন চলিয়া গিয়াছে।

আমিয়র পাশের ঘরেই পিসী থাকেন। সে রাত্রে তাঁহার সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে শুনিলেন, পাশের ঘরে কে অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বহুক্ষণ তিনি জাগিয়া রহিলেন এবং সমস্ত ক্ষণই অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন!

পিসী আসিয়া বলিলেন, বৌটাকে কি মেরে ফেলবি, অমি?

অমিয় বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন?

পিসী বলিলেন, কেন কি, আজ যে দুদিন ও অন্নজল গ্রহণ করে নি; একটা খোঁজও করতে নেই! পিসীর কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই কঠোর হইয়া গেল, বলিলেন, তুই আর চাস্ কি? সম্পত্তি ত' সবই পেয়েছিস্, এখন কি পরের মেয়েটার জীবন নাশ করতে চাস্? তা' স্পষ্ট করে বল্ না, ও বিষ খেয়ে মরুক! আমারও যেমন মরণ—

নিজের মনে বকিতে বকিতে পিসী চলিয়া গেলেন।

অমিয় স্ত্রীর ঘরে গিয়া বলিল, তুমি নাকি কিছু খাও নি?

সুরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, খেয়েছি।

অমিয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, খেয়েছো? তা বেশ করেছো। কিন্তু তোমাকে শুকনো দেখাচ্ছে কেন? অসুখ বিসুখ করে নি ত'?

সুরমা বলিল, না ও কিছু না—

অমিয় বিজ্ঞের মত বলিল, কিছু না হ'লেও শরীরকে অবহেলা করো না। সময়টা অতি খারাপ, সাবধানে থেকো।

সুরমা মরিবে বলিয়াই বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। উপবাস বন্ধ করিল, কিন্তু রোগ টানিয়া আনিল।

ডাক্তার এবং ঔষধ যত বাড়িতে লাগিল, রোগ ততই চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

অবশেষে জীবনের আর কোনই আশা রহিল না।

অমিয় কর্ত্তব্য করিল, কিন্তু নিজের কাজে ফাঁকি পড়িল না। সুরমার শিয়রে বসিয়া অনেক বিনিদ্র রাত্র কাটাইল, কিন্তু সেবা করিয়া নহে, বই পড়িয়া। তাহার লাইব্রেরী এক ঘর হইতে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হইল মাত্র।

সেদিন অবস্থাটা ভাল ছিল না বলিয়া ডাক্তার অনেক রাত্রি অবধি বসিয়া কাটাইলেন।

অমিয় পাশের ঘরে ছিল, এক সময়ে আসিয়া ডাকিয়া উঠিল, ডাক্তার বাবু।

তাহার কণ্ঠস্বরে সকলেই চমকিয়া উঠিল। রোগীর তন্দ্রা আসিতেছিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিল।

ডাক্তার নিঃশব্দে অমিয়র নিকট আসিয়া বলিলেন, কি বলছেন?

অমিয় ডাক্তারকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে স্তূপীকৃত পুস্তকের সম্মুখে বসাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, জীবনভরা এত সমস্যা, আপনার ডাক্তারী-শাস্ত্রে এর কোন সমাধান আছে কি, বলতে পারেন?

ডাক্তার প্রশ্নের অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া কিছুক্ষণ অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে একটা কিছু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, জীবনের সমস্যা নিয়ে ত' আমাদের শাস্ত্র তৈরী হয় নি, তবে সব সমস্যা যখন শেষ হ'য়ে আসে, তখনই আমাদের শাস্ত্র আসে।

অমিয়র মুখে গভীর হতাশা ফুটিয়া উঠিল। সে মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া বলিল, নাঃ। তারপর ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ডাক্তার আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিলেন।

স্ত্রীর নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপের দিকে চাহিয়া অমিয়র মনে এই একটি প্রশ্নই উঠিয়াছে, জীবনের অর্থ কি?

এই ঘরেই পিতা মরিয়াছেন, তিনি কিছুই বলিয়া যান নাই। পাশের ঘরে স্ত্রী মরিতে বসিয়াছে, সেও কিছু বলিতে পারিবে না। দেশ-দেশান্তরের পুস্তক ঘাঁটিয়া উত্তর মিলে নাই। ডাক্তারও জানে না।

বলিবে কে, এ জীবন কেন সৃষ্ট হয় এবং কেনই বা বিনষ্ট হয়? সহস্র জীবনে সহস্র বৈচিত্র্যই বা কেন? একজনের জীবননাশ করিয়া আর একজন বাঁচিতেছে। কিন্তু আর একজনের বাঁচিবার কি দরকার ছিল?

ডাক্তার আসিয়া ডাকিল, অমিয় বাবু? অমিয় ডাক্তারের দিকে চাহিতে তিনি সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, আর ভেবে কি করবেন বলুন, সবই ভগবানের হাত।

ভগবান! ফাঁকি দিবার এমন প্রকৃষ্ট পন্থা আর একটিও নাই।

ডাক্তার পুনরায় কহিলেন, এখন অবস্থাটা একটু ভাল। ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি, এখনই ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনি ওই ঘরেই বরং একটু বসুন।

সুরমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অমিয় লুব্ধদৃষ্টিতে তাহার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রহস্যময় জীবনের সমাধান খুঁজিতে লাগিল।

পিসী কিছুকাল অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অতিশয় ভুল বুঝিয়া বলিলেন, আমি কিছুক্ষণ পরে আসছি, তুই ততক্ষণ ব'স্। পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমার আহ্নিকটা সারা হয় নি, অমনি সেরে নিগে' যাই। তুই এক কাজ করিস্। যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, এই লাল ওষুধটা একদাগ খাইয়ে দিবি। ভুলবি না ত?

অমিয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

এক সময়ে অমিয়র হঠাৎ কি মনে পড়িল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাশের ঘর হইতে একটা বই আনিয়া পাতার পর পাতা উল্টাইতে লাগিল। কেহ দেখিলে বলিত, তাহার দেহটাই শুধু বসিয়া আছে, মনটা একান্ত সূক্ষ্ম হইয়া কোথায় হারাইয়া গিয়াছে!

কোন্ সময়ে সুরমা চোখ মেলিয়া চাহিল, অমিয় তাহা লক্ষ্য করিল না। অব্যক্ত যন্ত্রণায় সুরমার দেহ বার বার আকুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি অমিয়র হুঁস্ হইল না।

অবশেষে একটা আর্ত্ত শব্দে তাহার জ্ঞান হইল। বইটা মুড়িয়া ধরিয়া স্ত্রীর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, ঘুম ভেঙ্গেছে?

স্ত্রী নিঃশব্দে স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিল, এবং বোধ হয় কথা কহিবার প্রচেষ্টাতেই তাহার সর্ব্ব শরীর আর একবার নড়িয়া উঠিল।

ঔষধের কথা মনে পড়িতে অমিয় ঔষধ ঢালিল। কিন্তু বেশী পড়িয়া গেল। সেটা পুনরায় শিশিতে ঢালিয়া, দাগ মাপিয়া দেখিল, ঠিক হইয়াছে। স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিল, এটা খেয়ে নাও ত'!

কোন উত্তর আসিল না, বা খাইবার জন্য কেহ হাঁ করিল না।

সুরমার মুখটা ফিরিয়া ছিল, তাহাতে ছায়া পড়ায়, সে মুখটা ভাল করিয়া দেখা গেল না। অমিয় ভাবিল, সে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জাগাইয়া তোলা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া ঔষধের গ্লাশটা টেবিলে রাখিয়া দিয়া পুনরায় বই খুলিয়া বসিল।

এক সময়ে পিসী আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, কি রে, উঠেছিলো কি?

অমিয় বলিল, হাঁ, আবার তখুনি ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

তবে ভালই, বলিয়া পিসী হেঁট হইয়া নিদ্রিত সুরমার মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন কাঠ হইয়া গেলেন।

কিন্তু মনের কোণে একটু সন্দেহ ছিল। অতি সন্তর্পণে কম্পিত হাত সুরমার কপালে ঠেকাইয়াই একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অমিয়র হাত হইতে বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে, মেয়েটাকে একেবারে মেরে ফেললি? একবার ফিরেও চাইলি না?

পিসী বলিলেন, আমি আর সংসারে থাকতে পারছি না, বাবা, তুই একটা বিয়ে থা' কর্, আমি কাশী গিয়ে থাকবো।

অমিয় বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, বিয়ে কর বললেই কি বিয়ে করা হয় পিসী?

পিসী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, না হয় তবে থাক্, আমি চললুম। একটাকে ত' মেরেছিস্, এবারে ওর মেয়েটাকেও মার্। বলি বিয়ে না করবি, ও দুধের বাছাকে দেখবে কে? তুই ত' বই নিয়ে প'ড়ে থাকবি, ও' কি চিরকাল মুখ শুকনো এর-ওর কাছে স্নেহের কাঙ্গাল হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?

কথাটা সত্য। অমিয়র মনে লাগিল।

সুরমা শিশু রাখিয়া মারা গিয়াছে, তাহার ভার লয় কে?

একজনের সাহায্য ছাড়া আর একজন বাঁচে কৈ?

এক দরিদ্রের কন্যার সহিত অমিয়র বিবাহ হইল।

৩

স্ত্রীর নাম ষোড়শী। সে স্বামীকে পাইল না, দূর হইতে পুস্তক পরিবৃত তাঁহার রূপ দেখিল মাত্র।

মনে হইল রসের বাষ্পটুকুও কখন শুখাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ক্ষোভ রহিল না। স্বামীর শিশু কন্যাকে অতি একান্তভাবে বুকে চাপিয়া ধরিল।

সতীন-ঝির প্রতি দরদ দেখিয়া লোকে অবাক্ হইল। মুখ টিপিয়া হাসিলও।

ষোড়শী কিন্তু পারুলকে লইয়া মাতিয়া রহিল। তাহার কোন কাজটা অন্যে করিতে পারিবে না। বিকালে যখন সে

ঝি-এর কোলে চড়িয়া বেড়াইতে যাইত, ষোড়শী ছাদের উপর যাইয়া দেখিত, ঝি ঠিক সাবধানে চলিয়াছে কি না। ঝিয়ের পাশ দিয়াই এক একটা মোটর সাঁ করিয়া চলিয়া যাইত, ষোড়শী ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া ভয়ে চোখ বুঁজিত। সহসা চোখ খুলিতে সাহস হইত না।

স্বামীর সহিত ষোড়শীর আলাপ হইল অনেক দেরীতে। কিন্তু পরিচয় মোটেই হইল না।

লোকমুখে কতগুলো অস্পষ্ট ইঙ্গিত শুনিত, পড়িতে পড়িতে তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। প্রথমা স্ত্রীকে নাকি নিজ হাতে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন।

স্বামীর পাশে শুইয়া তাহার ভাল ঘুম হইত না। গায়ে যেন কাঁটা দিয়া থাকিত। এখন আর সে ভয় নাই, তিনি লাইব্রেরী-ঘরে কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়েন, কোন্ সময়ে উঠেন তিনিই জানেন!

স্বামীকে না পায় না পাক্, পারুলকে সে পাইতে চায়। একটু চোখছাড়া করিতে তাহার প্রাণ শত অমঙ্গল-আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠে।

তবু শুনিতে পায়, সে সতীন-মা।

চোরা-বালিতে পা পড়িলে মানুষ উঠিবার যতই চেষ্টা করে, ততই সে বসিয়া যায়।

অমিয়র অবস্থা ঠিক তাই হইল।

জীবনের এক রহস্যের সন্ধান খুঁজিতে গিয়া শত-রহস্য তাহাকে ঘেরিয়া রহিল। দেশ-বিদেশ হইতে বইয়ের পর বই আসিতে লাগিল। কিন্তু কোনই সমাধান মিলিল না।

ক্রমে তাহার আহারে বিহারে নিদ্রায় ও তন্দ্রায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিয়া তাহার সমস্ত জীবনকে প্রশ্নময় করিয়া তুলিল।

রাত্রে শুইয়া ভাবিত। হঠাৎ একটা কিছু মনে পড়িয়া গেলে তাড়াতাড়ি বই খুলিয়া দেখিত, ঠিক মিলিয়াছে কি না।

হয় ত' মিলিয়াছে, কিন্তু মূল প্রশ্নই যে অমিল থাকিয়া যায়।

অত্যাচারে তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, এইবার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ডাক্তার ঔষধ দিলেন, এবং বিধি দিলেন, সম্পূর্ণ বিশ্রাম। পড়া ত' দূরের কথা, চিন্তা পর্য্যন্ত নয়।

অমিয় পড়া ছাড়িল, কিন্তু চিন্তা তাহাকে ছাড়িল না। মস্তকের অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে করিতে কতবার তাহার মনে হইয়াছে, সে যদি মরিয়া যায়—

মানুষ ত' সকলেই মরে, সে জন্য তাহার দুঃখ নাই। কিন্তু মরার প্রয়োজন কি?

তারপর? মৃত্যুর পর?—

এমনি কত প্রশ্ন আসিয়া তাহার মাথায় চাপিয়া বসে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিলাত হইতে একগাদা বই আসিল,—সমস্ত আত্মতত্ত্ব, ও মৃত্যুতত্ত্ব লইয়া। অমিয় ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত রাত্র জাগিয়া পড়িল। পরদিন আর মাথা তুলিতে পারিল না।

ষোড়শী তাহার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল, একসময়ে অমিয় চোখ মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমি যদি মরিয়া যাই?

ষোড়শী আড়ষ্ট হইয়া গেল।

অমিয় আর কিছু বলিল না। কিন্তু মনে মনে এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল।

এমনি করিয়াই চলিতে লাগিল। যখন একটু ভাল থাকে, পড়াশুনা করে, যখন একেবারে পারে না, শুইয়া পড়ে।

কপালে একটির পর একটি দাগ পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার বলিলেন, ইহার ঔষধ নাই। বায়ু পরিবর্ত্তনে উপকার হইতে পারে। তাহারই আয়োজন চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে অমিয় পুনরায় কখন লুকাইয়া মদ ধরিয়াছিল, প্রকাশ পাইয়া গেল। পিসী রাগ করিয়া সত্যই কাশী-যাত্রার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু তাহাতে অমিয়র মদ খাওয়া বাড়িল বই কমিল না। ডাক্তারের ঔষধ পড়িয়া রহিল। বিদেশ-যাত্রাও এখন স্থগিত রহিল।

আগে ছিল, মদ ও মেয়ে—

এখন হইল, মদ ও পড়া—

পিসী সত্যই একদিন রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা হইতে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টি নামিল রাত্রি প্রায় বারটায়।

সঙ্গে ঝড়।

সশব্দে উপর্য্যুপরি দুইটা বাজ পড়িল। পারুল ভয়ে কাঁপিয়া মা'য়ের কোলে লুকাইয়া রহিল।

ষোড়শীর নিজেরই ভয় হইতে লাগিল। উঠিয়া জানালাগুলো বন্ধ করিয়া আবার মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়া চকচকে আলো আসিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ বুঁজিয়াও সে দেখিতে লাগিল। তারপরই একটা ভীষণ শব্দ। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল।

বাড়ীতে পিসী নাই। চাকরবাকরেরা কে কোথায় আছে, কোন ঠিকানা নাই। এক আছেন পাগল স্বামী,— ঠিক একটা ঘর পরেই।

প্রাণপণে চোখ বুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল।

জানালার ফাঁক দিয়া আর একবার দপ্ করিয়া আলো আসিল, কিন্তু সে আলো আর নিবিল না।—

ষোড়শীর মনে হইল, ঘরে আগুন লাগে নাই ত!

তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া যাহা দেখিল, তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ও তাহাদের শয্যার পাশেই স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন।

অতি ভরসায় ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ে সে কাঠ হইয়া গেল।

স্বামীর চোখ জবাফুলের মত লাল,—এবং সে দুইটা যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া তিনি পারুলের দিকে নিষ্পলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

ষোড়শীর হঠাৎ মনে পড়িল এই লোকটিই একজনকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত তাহার আপাদ-মস্তকে বার বার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। মাথাটা রিম্ রিম্ করিয়া উঠিল।

দেখিল, তাহার পাগল স্বামী কখন পারুলকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন।

তাহার মাথায় যেন মুহূর্ত্তে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

পরদিন ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া বসিতেই দেখিল আলো জ্বলিতেছে। এক নিমেষে কল্য রাত্রের ঘটনা সমস্ত মনে পড়িয়া গেল। দেখিল পারুল নাই।

বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

বলিল, খুকী? খুকী কই?

ঝী বলিল, সে বেড়াইতে গিয়াছে।

ষোড়শী বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে।

কাল রাত্রে তাহাদের যে কি ঘটিল, কিছুই মনে নাই। এমন কি আলোটাও নেবানো হয় নাই।

ঝী তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, তুই যা, আমি যাচ্ছি।

ঝী গেল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বাইরে দাদাবাবু—

ষোড়শী কল্যকার কথা স্মরণ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, দাদাবাবুর কি হয়েছে?

ঝী কিছুতেই বলিয়া উঠিতে পারিল না।

কথাটা শুনিতে বাকী রহিল না, অমিয় কাল রাত্রে হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে।

লোকজন সরিয়া গেলে ষোড়শী স্বামীর ঘরে ঢুকিল। প্রথমে কিছুই দেখিল না। পরে দেখিল, কে একজন চারিদিকে এক গাদা বই ছড়াইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে।

চিনিতে বিশেষ দেরী হইল না, এই তাহার স্বামী।

প্রথম বারিধারা

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

প্রথম বারিধারা, আজিকে হ'ব হারা
আঁধারে!
আজিকে পথে আর, নাহি যে নাহি আর
বাধা রে।
তৃষিতা ধরণীর নয়নে বহে নীর
নিদাঘে।
মাটির সব গান নীরবে অবসান
বিরাগে।
শ্যামল বৈভব, প্রদানি' গৌরব
ধরা-তে।
রিক্ত সরোবর, নদী ও নির্ঝর
ভ'রাতে!
ফুটা'তে তৃণফুল প্রকাশ-বেয়াকুল
ভুবনে,
বরষা এলে আজ নিবিড় ঘন সাজ
গগনে॥

প্রথম সৃজনের অচল তিমিরের
মাঝারে।
অগম মনোরথ রহিল মৃতবৎ
পাথারে।

সেথায় আজি মোর নীরবে লাগে ঘোর
নয়নে।
রহিনু জীবনের গভীর স্বপনের
বপনে॥

প্রথম বারিভার লহ' গো উপহার
নীরবে।
আজিকে মানুষের বেদনা-হরষের
বিভবে।
প্রবীণ ধরা 'পর তুমি যে সহচর
সৃজনে,
প্রদানো অঞ্জন নয়ন-রঞ্জন,
জীবনে॥

আজিকে ঝরি' যাও, ব্যাকুল দোলা দাও
হৃদয়ে,
সৃজন কোথা' হায়? প্রলয় বহি' যায়
আলয়ে!
প্রথম বারিভার, টুটে না মোহ আর
এ দিনে।
গভীর দীনতায় বায়ু যে বহি' যায়
বিপিনে।
নিখিল-মানবের বেদনা আজিকের
আকাশে।
সৃজন কোথা' তায় প্রলয় হেরি হায়
প্রকাশে॥